

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

প্রকাশ করেছেন ঃ
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ এঁকেছেন ঃ
নিতুন কুণ্ডু
ছেপেছেন ঃ
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

SAHITYA O ANYANYA PRASANGA
By Abul Fazal
MUKTADHARA
[Swadhin Bangla Sahitya Parishad]
74 Farashgonj
Dacca—1
Bangladesh

সূচীপত্র

সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

নজরুল কাব্যের ভূমিকা

যে-কোন কবিকে বুঝতে হলে তাঁর দেশ, কাল আর সামাজিক ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে বুঝতে হয়। যত বড় প্রতিভাবান কবিই হোন, সে-সবের উর্ধ্বে বা সে-সব থেকে বিচ্ছিন্ন তিনি নন। বরং অধিকতর সচেতন ও সংবেদনশীল বলে তাঁর মন-মানসে সে-সবের স্পর্শ লাগে অতি সহজে, অতি দ্রুত আর অতি তীব্রভাবে। নজরুলের বেলায় তা আরো বেশী করে ঘটেছে এ কারণে যে, তিনি অতিমাত্রায় ঐ-সবের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিসত্তা আর কবি-সত্তা মিশিয়ে ফেলেছিলেন—সজ্ঞানে এবং স্বেচ্ছায়। শিল্পকে তিনি কখনো মানুষের থেকে বড় করে দেখেন নি। তার ফলে তাঁর বহু রচনায় শৈল্পিক ত্রুটি ঘটলেও তা তিনি গ্রাহ্য করেন নি মোটেও। এ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ভংগিতে একাধিক কৈফিয়তও তিনি দিয়ে রেখেছেন। কাজেই তাঁর কবি-দৃষ্টি আর ভূমিকা সম্বন্ধে ভুল করার সম্ভাবনা কম।

আমাদের ইতিহাসের এক বিশেষ পর্বে নজরুলের আবির্ভাব—সে কথা স্মরণ রেখেই তাঁর শিল্পীসত্তা আর কবি-কর্ম বিচার্য। এ যুগের ধ্যানধারণা বা বিশ্বাস-অবিশ্বাস তাঁর উপর আরোপ করে তাঁর রচনার মূল্যায়ণ করতে গেলে বিভ্রান্তি অনিবার্য। মনে হয় ইকবালের বেলায়ও এ বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। তিনিও পাকিস্তান-পূর্ব যুগের প্রেক্ষিতে এমন অনেক অনবদ্য কবিতা লিখেছেন যার উৎসমূল আমাদের বিশেষরকমের সামাজিক ঐতিহ্য নয়। এককালে তাঁর 'ভারত-বন্দনা' কংগ্রেসের উদ্বোধনী সংগীত হিসাবেও গাওয়া হতো। বলা বাহুল্য এ দেশে সামাজিক ঐতিহ্য মানে ধর্ম-ভিত্তিক ঐতিহ্য। প্রাচ্য দেশে আজো সমাজ-জীবন

পুরোপুরি ধর্ম-কেন্দ্রিক—কবিবিশেষেরও এ ঐতিহ্যেই জন্ম, বিকাশ আর পরিণতি। চারদিক থেকে ঘিরে থাকা এ বিরাট ঐতিহ্যের অভিজ্ঞতা আর প্রভাব কোন কবিই ডিঙিয়ে যেতে পারেন না। তাই সর্বতোভাবে সেকুলারমনা কবিদের রচনায়ও এ ঐতিহ্যের ছাপ সুস্পষ্ট। এমন কি অনেকের প্রধান রচনাগুলিরও মূল-উৎস এ ঐতিহ্যাশ্রয়ী। তাই বলে দেশ-কালের ঐতিহ্যাশ্রয়ী রচনাগুলিকে বাদ দিয়ে স্রেফ সামাজিক বা জাতীয় ঐতিহ্যভিত্তিক রচনাগুলিকে নিয়েই যদি কোন কবিবিশেষের মূল্যায়ণ করতে চেষ্টা করা হয় তা'হলে তাঁর প্রতি সুবিচার করা হয় না। আর তা করে কোন কবির সামগ্রিক পরিচয়ও যায় না পাওয়া। তাই সমালোচক আর গুণগ্রাহীদের একটা সামগ্রিক দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বড় কবিদেব দেখা মানে অন্ধের হস্তী দেখা। তেমন দেখা কখনো সাহিত্যের দেখা নয়। আর এও বিশেষভাবে স্মরণীয়। সৃজনশীল প্রতিভার স্বভাব নয় একনিষ্ঠ পাতিব্রত্যের। অবস্থা আর প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে আবেগের স্বরূপও রূপান্তরিত হয়—কবির মন-মেজাজ বা Mood-এর ঘটে পরিবর্তন, এমনকি বিশ্বাস-অবিশ্বাসেও ধরে ফাটল। যে-কোন কবিতায় আবেগ এক অপরিহার্য শর্ত—আবেগ ছাড়া কবিতা কবিতাই হতে পারে না। এ আবেগী অভিজ্ঞতাই রচনায় হয় রূপায়িত যা পাঠকের সুপ্ত আবেগকেও নাড়া দিয়ে সচেতন করে তোলে। টলষ্টয় শিল্পের এ সংজ্ঞা দিয়েছেন : "Art is a human activity consisting in this that one man consciously, by means of certain external signs, hands on to other's feeling he has lived through, and that others are infected by those feeling and also experience them." শিল্পের এ এক সরল ব্যাখ্যা হলেও, শিল্প বা কাব্যের ভূমিকা সম্বন্ধে এ ব্যাখ্যা অনেকখানি যথাযথ। শিল্প এভাবেই রচিত হয় আর এভাবেই হয় সার্থক। External sings, external events-ও বলা যায় কালের সঙ্গে সঙ্গে যা প্রতিনিয়তই আবর্তিত হচেছ্—ফলে শিল্পীর আবেগ আর মন-মেজাজেও বিবর্তন অনিবার্য। এ কারণে রচনায় সাময়িকতার স্পর্শ না লেগে পারে না। টলষ্টয়ের consciously কথাটাও মূল্যবান—সচেতনতা ছাড়া খাঁটি শিল্পী অকল্পনীয়। সব শিল্পকর্ম সচেতন মন আর সচেতন প্রয়াসেরই সৃষ্টি। নজরুলের কবি-জীবন সংক্ষিপ্ত হলেও এ সময়টুকু তিনি সব সময় সচেতন আর সৃজনশীল ছিলেন। এমন কি সত্যিকার সৃজনশীলতার বাইরেও প্রয়োজনের তাগাদায়ও অজস্র লেখা

তিনি লিখেছেন—বাহ্যিক Sign বা অবস্থা তা লিখতে তাঁকে বাধ্য করেছে। এখান থেকে ওখান থেকে কিছু লেখা বাছাই করে বিচার করতে চাইলে যে-কোন বড় কবিকে ইচছামতো এমন কি নিজের প্রয়োজনমতো প্রমাণ করা যায়। সমুদ্রে যেমন খাদ্য-খাদকের সহ-অবস্থান তেমনি বড় কবিদের রচনায়ও স্ববিরোধিতার সহ-অবস্থান অতি স্বাভাবিক। গোঁড়া বা পিউরিটানের মানস-চেতনা একরোখা বা এক-স্রোতা, জীবনের ডানে বাঁয়ে, উর্ধ্বে অধেঃফিরে তাকাবার অবসর নেই তাঁর। কিন্তু কবির দৃষ্টি সামগ্রিক। তাই জীবনের কোন কিছুই তাঁর কাছে পরিত্যাজ্য নয়, ভালো-মন্দ আর পাপ-পুণ্যে মেশানো জীবনের সব কিছুকে তন্ন তন্ন করে দেখা, সব বন্ধ, দরজা ভাঙ্গা, এমনকি অবচেতনের অতলে উঁকি মারাও তাঁর স্বভাব। কোন মহৎ কবিই কোন কালে পিউরিটান নন—নজরুল ত নন মোটেও। 'বারাঙ্গনাকে মা সম্বোধন করতে পিউরিটানের মাথা কাটা যাবে, কিন্তু নজরুলের কবিসত্তা হয়েছে তাতে উদ্দীপিত। চিরন্তন নারীত্বের অতল গহনে উঁকি মেরে মাতৃত্বের যে দুর্লভ উপলব্ধি তাঁর মানস চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে—তাঁর কাছে বারাঙ্গনার দেহ-কলুষ শুধু নয় শাস্ত্র-অশাস্ত্র নীতি-অনীতি সবই তুচছ হয়ে গিয়েছে। ফুটেছে শাশ্বত নারীত্বের এক মহিমময় রূপ। মহৎ কবির উপলব্ধি এমনি সার্বজনীন। আর মহৎ প্রতিভা চিরকালই দুঃসাহসী। নজরুল প্রত্যয়ী আর বক্তব্য-প্রধান কবি এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কাব্যের ক্ষেত্রে এমন সুদৃঢ় প্রত্যয় খুব কম দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে নজরুলের কবিতা যে বক্তব্য-প্রধান হয়ে উঠেছে তাতে সন্দেহ নেই। এ-সব কবিতায় তাঁর প্রত্যয় আর বক্তব্যকে ফুটিয়েছে ভাষা ছন্দ আর তাঁর নিজস্ব রচনাশৈলী—যা সবদিক দিয়েই বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র। ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাষায় কবিতা মানে: A man speaking to men, কাজেই কাব্যে বক্তব্য কিছুমাত্র নিন্দনীয় নয়। যুগ আর কবি-প্রেরণা নজরুলকে শুধু মানুষের কবি করে নি, করেছে দেশের কবি, জাতির কবি, সমাজের কবি। এমন কি, বিশেষ বৃত্তি বা পেশার কবিও তাঁকে হতে হয়েছে। হয়েছেন এ সবেরও তিনি মুখপাত্র। কোন মহৎ কবিই বক্তব্যহীন নয়। নজরুলের কবিকন্ঠে বক্তব্য অধিকতর গোচ্চার হওয়ার কারণ তাঁর যুগ আর তাঁর যুগের মানবিক দাবি। মানবতার ব্যাপারে নজরুল কখনো, কোন অবস্থাতেই এতটুকু আপসী মনোভাবের পরিচয় দেননি। এ ক্ষেত্রে এ যুগে নজরুল একক ও অদ্বিতীয়। নজরুল শুধু মামুলি অর্থে মানবের কবি

নন, তাঁর মানবতার উপলব্ধি ছিল সর্বসত্তা দিয়ে। তাই কাব্যে এমন হুকুমের সুরে কথা বলা তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছে :

"শোনো মানুষের বাণী,

জনমের পর মানব জাতির থাকে নাক কোন গ্লানি।"

কবির কণ্ঠে কি অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়ের সুর।

অথবা

কিন্তু কেন এ পণ্ডশ্রম মগজে হানিছ শূল ?

দোকানে কেন এ দরকষাকষি ? পথে ফুটে তাজা ফুল।

তাজা ফুল মানে তাজা ও জীবন্ত মানুষ। শাস্ত্রকে যেমন নজরুল খুব বড় স্থান দেননি তেমনি রচনার শিল্প-সৌন্দর্যকেও দেননি তাঁর বক্তব্যের ঊর্ধ্বে আসন। দেশ-কাল আর সমাজের দাবি মিটাতে গিয়ে এ না করে তিনি হয়তো পারেননি। না হয় শিল্পোত্তীর্ণ রচনাও তিনি কম লিখেন নি। স্বল্পসংখ্যক কবিতায় আর অজস্র গানে তার পরিচয় রয়েছে।

নিজের বিশ্বাস আর প্রত্যয়কে জোরালো আর সর্বজনবোধগম্য করার জন্য বহু অ-কাব্যিক শব্দকেও তিনি স্থান দিয়েছেন কবিতায় বিনা দ্বিধায় :

শিহরি উঠো না, শাস্ত্রবিদেরে করো নাক বীর ভয়,

তাহারা খোদার খোদ প্রাইভেট সেক্রেটারিতো নয়।

অন্যত্র :

মোল্লা হাঁকিল—'তা হলে শালা সোজা পথ দেখ।'

অত্যন্ত বাস্তববাদী কবিও এমন সিরিয়াস কবিতায় এ ধরনের শব্দ প্রয়োগ করবে কি না সন্দেহ। যাঁরা ভাষাগত কারুকার্যকে নিজেদের বক্তব্যের চেয়ে বড় স্থান দেন তাঁদের পক্ষে এমন প্রয়োগ হয়তো ভাবাই যায় না। বলা হয়ে থাকে নজরুল যুগে নজরুলের চেয়ে জনপ্রিয় কবি আর ছিল না। কথাটা সত্য। এমন কি, তাঁর জনপ্রিয়তা সেদিন নোবেল প্রাইজবিজয়ী কবিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কেন এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল ? কারণ তাঁর সম-সাময়িকরা খুঁজে পেয়েছিল প্রেম-ভালবাসা, ঘৃণা আর প্রতিবাদ ইত্যাদি সব কিছু তাঁর কাব্যে, তাঁর গানে, তাঁর গদ্যে। বিশেষ করে সেদিন তরুণ সমাজের মনো-মানস যে জিজ্ঞাসা, অসন্তোষ আর দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আলোড়িত ও মথিত হচ্ছিল তার প্রকাশ ও অভিব্যক্তি তারা খুঁজে পেয়েছিল নজরুলে

আর নজরুল-সাহিত্যে। সে সাহিত্যের ভাষা ছিল অসন্দিগ্ধ, হৃদয়-বেদ্য আর মর্মস্পর্শী, তাতে ছিল না কিছুমাত্র রহস্যময়তা। ওয়ার্ডসওয়ার্থের যে কথা কবিতা মানে A man speaking to man—কাব্যের ভাষা ও ছন্দে নজরুল কথা বলেছেন, কিন্তু বলেছেন ব্যক্তিমানুষ শুধু নয়, কাল আর দেশকে, সমাজকে বৃহত্তর জনতাকে। তাই তাঁর ভাষা আর ছন্দ জনগণ-মনবোধগম্য না হয়ে পারেনি। যুগটাই তখন ছিল বিদ্রোহের, শুধু নিজের দেশের নয়, অন্যত্রও। তাই যুগকবি নজরুল আর তাঁর বিদ্রোহী কবিতা পৃথিবীর তাবৎ বিদ্রোহের প্রতীক হয়েই যেন দেখা দিয়েছিল সেদিন। তাঁর বেলায় কবি আর কবিতা হয়ে পড়েছিল একাত্ম। সাহিত্যের ইতিহাসে এ এক বিরল দৃষ্টান্ত। সেদিন বাংলা ভাষায় 'বিদ্রোহ', 'বিপ্লব', 'প্রলয়', ধ্বংস' ইত্যাদি কথার মতো জনপ্রিয় কথা আর ছিলই না, আর এ সবের বাহন ছিল নজরুল আর নজরুল-কাব্য। তাই তাঁর কাব্যের নাম অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, ভাঙ্গার গান ইত্যাদি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের ধ্বংস তিনি দেখেছেন স্বচক্ষে--দেখেছেন তার বীভৎসদংষ্ট্রা কবি, সে সঙ্গে দেখেছেন মানবতার এক নব-জাগরণও। চোখের সামনে দেখতে পেয়েছেন দুনিয়াব্যাপী পরাধীন আর ক্ষুব্ধ সর্বহারারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সর্বত্র। বসফোরাসের তীর থেকে বঙ্গোপসাগরের বেলাভূমি পর্যন্ত কাঁপছে তখন অসন্তোষ আর বিদ্রোহের ঝড়ে। এশিয়া-আফ্রিকার অগণিত মানুষের মন আলোড়িত আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে, নির্যাতিত মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে ক্ষুব্ধ গর্জন। রাশিয়ায় দেখা দিয়েছে শোষক আর শোষিতের মরণপণ সংগ্রাম। দীর্ঘ সুপ্তির পর মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে শুরু হয়েছে স্বাধীনতার লড়াই—প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ। কামাল পাশা, আনোয়ার পাশা, রেজা শাহ্ পাহ্‌লভী, আমানুল্লাহ, রীফ সরদার আবদুল করিম--এঁরা সকলেই আজাদীযুদ্ধের প্রতীক, চলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। পাক-ভারত উপমহাদেশে তখন অসহযোগ—খেলাফৎ আন্দোলনে আলোড়িত ও বিক্ষুব্ধ। শুরু হয়েছে স্বাধীনতার সংগ্রাম এখানেও। রবীন্দ্রনাথ তখন ষাটের কোঠায়, রণভেরী বাজাবার বয়স তাঁর নয়। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি ও ভাবাদর্শ কখনো বিদ্রোহী যোদ্ধার ছিল না এবং মুসলমানের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে তিনি ছিলেন না-ওয়াকেব। ফলে এ যুগ-চিত্তের পুরো-পুরি বাণীর বাহক হওয়ার সামর্থ্য ও যোগ্যতা তাঁর ছিল না। তখন যেন এক অধীর উন্মুখ আর প্রতীক্ষাকাতর চিত্তে দেশকাল-যুগ-সমাজ সব কিছু যেন তার চারণকবির প্রতীক্ষায় ছিল। সে প্রতীক্ষা আর চাহিদারই ফলশ্রুতি নজরুল ইসলাম। মুহূর্তে দেশ-কাল-যুগ যেন খুঁজে পেল তার কবিকে।

তাঁর কণ্ঠে বাণীময় হয়ে উঠল দেশ আর জাতির অসন্তোষ আর আশা-উন্মেষ। দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম, মুসলিম দেশগুলির নবজাগরণ, শোষিত শ্রেণীর জয়যাত্রা, মানবতার নবচেতনা ও বেঁচে থাকার লড়াই, তারুণ্যের বেপরোয়া বাঁধনহারা উল্লাস এ সবেরই তিনি কবি, এ সবেরই তিনি বাণীমূর্তি। যেখানে যা কিছু অবিচার, অন্যায়, জুলুম ও পরাধীনতা সেখানেই তিনি হেনেছেন আঘাত। ক্ষমা করেন নি প্রতিক্রিয়াশীল কোন শক্তিকেই। দাসত্ব আর পরাধীনতার বিরুদ্ধে তাঁর মতো এদেশের আর কোন কবিই সংগ্রাম করেন নি, এমন বিদ্রোহের বাণীও কেউ করেন নি প্রচার। মুসলিম জগতের নব-জাগরণের কথাই বা তাঁর মতো এত উদাত্ত কণ্ঠে আর এত বিচিত্রভাবে কেইবা প্রকাশ করেছেন? ইসলামের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য আর তার বীর্যবন্ত সত্যের অনন প্রদীপ্ত বাণী-রূপ নজরুলের রচনা ছাড়া অন্যত্র দুর্লভ বল্লেই চলে। সহস্র কণ্ঠে, সহস্র যন্ত্রে ইসলামের যে মর্মবাণী মুসলমানের মনের আকাশে একদিন সঞ্চার করেছিল এক অভূতপূর্ব আশা ও উদ্দীপনা, জাগিয়ে তুলেছিল তাঁর মনে অটুট এক আত্মপ্রত্যয়, আজাদীর সোনালী স্বপ্নে তাঁর মন হয়েছিল বিভোর। সৈনিক কবির এ বিচিত্র ভূমিকা আমাদের সংগ্রামী যুগের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় হয়ে আছে। এমন ভূমিকা পালন যে কবির বিধিলিপি, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় স্বদেশ আর স্বজাতির ইতিহাসের দায় যাঁর উপর এসে পড়েছে তাঁর পক্ষে বক্তব্য ভুলে নৈর্ব্যক্তিক হওয়া যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় রচনার অঙ্গসজ্জায় দীর্ঘ-কালাতিপাত। নজরুল কোন অর্থেই আত্মরতির কিংবা আত্ম-মগ্ন কবি নন। এখানে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিরাট পার্থক্য। কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের' সহিত নজরুলের 'বিদ্রোহী'র তুলনা দিয়ে থাকেন। কিন্তু 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'— কবির ব্যক্তি-চিত্তেরই স্বপ্নভঙ্গ, তার লক্ষ্য ও আবেদন অন্বেষা ও সম্পূর্ণ ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। একটি বিশেষ ব্যক্তিরই তা আত্ম-আবিষ্কার। 'বিদ্রোহী' কিন্তু তা নয়—এ বিদ্রোহী সমস্ত যুগেরই প্রতিনিধি, সমস্ত মানবাত্মারই প্রতিভূ।

নজরুল যখন বলেন:

বল বীর চির-উন্নত মম শির।

তখন তিনি শুধু নিজের কথা বলেন না, এ আহ্বান শুধু নিজের প্রতি নয়, দেশের প্রতি, জাতির প্রতি, নির্যাতিত মানবতার প্রতি। আত্ম-রতিপরায়ণ কবির উক্তি এ নয়। নজরুলের এ বিদ্রোহ সর্বমানবিক। তাই এ বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি তখন মাত্র—

'যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না'। বলাবাহুল্য এ কণ্ঠস্বর কবির একার নয়। নজরুলের এ কবিতা সর্ববন্ধন-মুক্তির এক অবিসংবাদিত প্রতীক হয়েই উঠেছিল সেদিন। মানবতার একটি নীরব কণ্ঠস্বর আছে, ইতিহাসের পাতা বেয়ে তা বয়ে চলেছে আদিকাল থেকে। সে কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে নজরুলের 'বিদ্রোহী'তে আর তাঁর কণ্ঠে। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' স্রেফ কবিচিত্তেরই জাগরণ—মানবচিত্তের স্বপ্নভঙ্গের আহ্বান নেই তাতে।

নজরুল যদি শুধু যুগ-কবির ভূমিকা পালন করেই নিঃশেষিত হতেন তা হলে নিঃসন্দেহে তাঁর রচনা ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ হয়েই থাকতো শুধু—মানুষের মনের চিরসঙ্গী হতে পারতো না। কিন্তু তাঁর এ স্বল্পকালীন কবি-জীবনে এমন দেদার রচনাও তিনি লিখেছেন যা মানবমনের আর বাংলাভাষার চিরসম্পদই হয়ে থাকবে। আমি তাঁর অগুণতি সংগীতের প্রতি ইঙ্গিত করছি—এমন বিচিত্র সুরের সমাবেশ অন্যত্র মিলবে কি না সন্দেহ। নজরুল-সংগীত যেন এক 'সব পেয়েছির দেশ'--এখানে শুনতে পাওয়া যায় নর-নারীর মনের নানারকম অনুভব-অনুভূতির সুর, প্রেমের আর বিরহ বেদনার সুরের তো অন্ত নেই ; আশা-আকাঙ্ক্ষার সুর, ধর্ম আর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সুরও দেদার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর ত তাঁর সংগীতের এক বড় বৈশিষ্ট্য, স্বদেশ ও স্বজাতির কথা, সে সঙ্গে রচনা করেছেন অজস্র প্রেমের গান, এমন কি হাসি-ব্যঙ্গের সুরও এ সংগীতকে দান করেছে বৈচিত্র্য। একক এত সুরের সংগীত অন্য-কোন সংগীত রচয়িতা করেছেন কি না সন্দেহ। রবীন্দ্র সংগীতের বিশাল সমুদ্রেও ভাটিয়ালী, কীর্তন, ভজন, গজল আর হাসি-ব্যঙ্গের গান তেমন খুঁজে পাওয়া যায় না। Community Song বলতে যা বুঝায় রবীন্দ্র-সংগীতে তার স্বল্পতা সহজেই লক্ষ্য-গোচর। রবীন্দ্রনাথকে খাটো করার জন্য একথা বলছি না, কারণ আমি জানি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ আশি বছরের জীবনে যা করেছেন—তার অর্ধেক বয়সে নজরুলের পক্ষে তা করা কল্পনাতীত। তবে এও স্বীকার্য যে, নজরুল এ স্বল্পজীবনে যা করেছেন তার অনেক কিছু বিপুল রবীন্দ্র-সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। বড় কারণ উভয়ের পরিবেশ আর অভিজ্ঞতা ছিল ভিন্নতর, মানস-গঠনও স্বতন্ত্র। তাই উভয়ের সাফল্য আর কৃতিত্বের চেহারাও আলাদা। এক দেশের আর এক ভাষার কবি হলেও দু'জন দুই সমাজ-জীবনেরই উৎপন্ন রচনায় তাঁর প্রভাব অনিবার্য। আভিজাত্য আর প্রাচুর্য রবীন্দ্রনাথকে এন্তার সুযোগ যেমন দিয়েছে—তেমনি তা তাঁর সামনে একটা

অনতিক্রম্য বাধা হয়েও ছিল, তাই তাঁর পক্ষে কৃষাণের কি জেলে-মজুরের কবি হওয়া সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে নজরুলের সামনে কোনরকম বাধাই ছিল না—তাই তাঁর কবি-প্রতিভা অনায়াসে হতে পেরেছে 'সর্বত্রগামী'। কবিতা আর সংগীতকে নজরুল যেভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, তাঁর যুগে আর কারো দ্বারা তা সম্ভব হয়নি। ম্যাক্সিম গোর্কি সম্বন্ধে হান্‌রিখম্যান যা বলেছেন নজরুল সম্বন্ধেও অবিকল সে কথা বলা যায় : Maxim Gorky has extended the realm of literature, for he has conquered new themes for her and new readers. He has depicted such class of society as were not known to literature before him. He has made proletrians the friends of literature. And if writers no longer depend totally and altogather on the taste and interests of the bourgeois world then for this we have to thank the genious of Gorky.

নজরুল-প্রতিভার কাছেও বাংলা সাহিত্য এজন্য ঋণী। তিনি সাধারণ মেহনতী মানুষের আশা-আকাঙক্ষা আর দঃখ বেদনাকেই যেমন তাঁর কাব্য আর সঙ্গীতে তুলে ধরেছেন তেমনি এ সব সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন সাহিত্যকেও। এভাবে তিনি যে শুধু সাহিত্যের বিষয়বস্তুর দিগন্ত বাড়িয়েছেন তা নয়, তাঁর পাঠক আর শ্রোতার সংখ্যা বৃদ্ধিতেও করেছেন সহায়তা। এও নজরুলের এক অনন্য কৃতিত্ব। তথাকথিত গণ-সাহিত্যের তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ এ দেশে। আমি আমার চার পাশে বহু পিয়ন, খানসামা, আর্দালী প্রভৃতি মেহনতী মানুষকে গ্রামোফোন কিনে নজরুলের ইসলামী সংগীতের রেকর্ড বাজিয়ে আনন্দ পেতে আর তন্ময় হতে দেখেছি। অথচ একদিন এদের কাছে সংগীত ছিল নিষিদ্ধ এলাকা। উপরে যে বন্ধ দরজা ভাঙ্গা শিল্প আর শিল্পীর এক ভূমিকা বলে উল্লেখ করেছি তার বহু প্রমাণ নজরুল এভাবে দিয়েছেন। আমাদের সাহিত্য, আমাদের কাব্য, আমাদের সংগীত নজরুলের কাছে অশেষ ঋণে ঋণী। তিনি কুড়ি বছরেরও কম সময়ে যা দিয়েছেন তার কোন তুলনা নেই।

নজরুল অধীতবিদ্যার কবি ছিলেন না—দেশ, কাল আর সমাজ ছিল তাঁর পাঠশালা। দুচোখ দিয়ে যা দেখেছেন, অন্তর দিয়ে যা অনুভব করেছেন তার থেকেই নিয়েছেন পাঠ। আর কাব্যরসে জারিত করে

তাই ফিরিয়ে দিয়েছেন আবার সাহিত্যকে। এ করেই রবীন্দ্রোত্তর যুগে হয়েছেন তিনি বাংলাভাষার প্রধানতম কবি এবং রবীন্দ্রপরিমণ্ডলের বাইরে আর এক রবি—যদিও আকারে ছোট, কিন্তু উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান। সংক্ষেপে নজরুলের কাব্য আর কবিসত্তার ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল এখানে। সব আলোচনারই মূল উদ্দেশ্য আলোচ্য কবির দিকে, তাঁর রচনার দিকে পাঠককে আহ্বান জানানো। আজ আমাদেরও এ লক্ষ্য। ত্রিশের আধুনিক কবিদের কেউ কেউ নজরুলের প্রতি খুব প্রসন্নদৃষ্টিতে তাকাননি বা পারেননি তাকাতে। তাঁদের অভিযোগ নজরুলের কবি-কণ্ঠ বড্ড সোচ্চার, তাঁর কবিতা বড় বেশী স্পষ্ট। মাথা কুঁড়ে তা অর্থ খুঁজতে হয় না। তাঁর ভাষা স্থানবিশেষ অমার্জিত। এ-সব অভিযোগ আংশিক সত্য হলেও তা যে কেন সত্য তা দ্ব্যর্থ ভাষায় উপরে আমি বলতে চেষ্টা করেছি।

পরিশেষে দ্ব্যর্থ ভাষায় বলছি—তবুও নজরুল এমন এক কবি যাঁকে না পড়লে বাংলা কাব্যপাঠ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, আর জীবনের বহু বিচিত্র স্বাদ থেকে হবে বঞ্চিত। বাংলা কাব্যের বিচিত্র ধারা, তার অপূর্ব সম্পদ আর সম্ভাবনার পরিচয় পেতে হলে নজরুলের কাছে আমাদের যেতেই হবে, নিতে হবে তাঁর কাব্যসংগীত আর বিচিত্র গদ্যরচনার খবর।

ভাষা আর লেখকের স্বাধীনতা

॥ এক ॥

অন্য এক প্রবন্ধে আমি বলেছি, মানুষ বিকাশধর্মী জীব। জন্ম থেকেই এ বিকাশের সূচনা আর এ বিকাশ প্রধানতঃ ভাষাশ্রয়ী। অন্যান্য জীবের দৈহিক বৃদ্ধি আছে কিন্তু মানসিক কিংবা নৈতিক বিকাশ নেই। মানুষের বেলায় প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পূর্ণ আলাদা। দৈহিক বৃদ্ধির সাথে সাথে মানসিক আর নৈতিক বিকাশ না ঘটলে মানুষ কিছুতেই হতে পারে না মানুষ। এ ছাড়া সেও স্রেফ আর এক দো-পায়া জীবমাত্র।

মানুষের মানসিক আর নৈতিক বিকাশের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। ভাষার পথ বেয়েই তার সবরকম বিকাশের সূত্রপাত। মায়ের মুখ থেকে শোনা এক-একটি শব্দ প্রথমে এক-একটা বস্তুরূপ নিয়েই দেখা দেয়, তারপর শব্দের পেছনে শব্দ যোগ হয়ে তা আস্ত একটা বাক্য বা বাক্যাংশ হয়ে শিশুর সামনে খুলে দেয় ভাবের বিচিত্র জগৎ। এভাবেই ঘটে তার মানস-বিকাশের গোড়াপত্তন। তারপর থেকে ধাপে ধাপে সে হয়ে ওঠে মানুষ, বাইরে যেমন তেমনি ভিতরেও। মানুষ হওয়ার পথে ভাষা মানুষের প্রধানতম হাতিয়ার। ভাষা মানে মাতৃভাষা—কারণ এ ভাষা তার সহজাত, জন্মসূত্রে প্রাপ্ত আর সহজে আয়ত্ত। তাই অন্য সব কিছু নিয়ে আপস চলে, কিন্তু মাতৃভাষা নিয়ে আপস চলে না। যেমন আপস চলে না মনুষ্যত্ব নিয়ে।

শাসকদের অদূরদর্শিতার ফলে মাতৃভাষা তথা মনুষ্যত্বের সংকট আমাদের জাতীয় জীবনের ১৯৫২ সালে একবার সর্বনাশা রূপ নিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। তার শোকাবহ পরিণতি সে বছরের একুশে ফেব্রুয়ারী। সে থেকে

একুশে ফেব্রুয়ারী আমাদের ইতিহাসে শুধুমাত্র শোক-চিহ্নিত হয়ে নেই—গৌরবে দীপ্ত এক স্বাক্ষর হয়েও আছে। উৎসর্গীকৃতপ্রাণ কয়েকটি উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় তরুণের অকালে, কচি বয়সে জীবন-প্রদীপ নিভে যাওয়া নিঃসংশয়ই শোকাবহ। কিন্তু যেহেতু মাতৃভাষার দাবি সত্য ও মনুষ্যত্বের দাবি, তাই বেয়নেট আর বুলেটের সামনে দাঁড়িয়েও সে দাবি নিয়ে এরা আপস করেনি। নিজেদের তরুণ প্রাণকে রক্তপদ্মের মতো মাতৃভাষার বেদীমূলে উপহার দিয়ে তারা সেদিন বরণ করে নিয়েছিল মৃত্যুকে। এমন মৃত্যুই মানুষকে দান করে অমরতা—এমন মৃত্যুই মানুষকে দেয় গৌরবের শিরোপা। একুশে ফেব্রুয়ারী শহীদেরাও তাই জাতির ইতিহাস আর স্মৃতিতে অমর হয়ে আছে। তাদের আত্মদানের গৌরব আর মহিমা কোনদিন ম্লান হবে না, যাবে না মুছে জাতির স্মৃতি থেকে।

জাতি শুধু বাইরের ঐশ্বর্য-সম্ভার, দালান-কোঠার সংখ্যাবৃদ্ধি কিংবা সামরিক শক্তির অপরাজেয়তায় বড় হয় না, বড় হয় অন্তরের শক্তিতে, নৈতিক চেতনায় আর জীবনপণ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ক্ষমতায়। জীবনের মূল্যবোধ ছাড়া জাতীয় সত্তার ভিত কখনো শক্ত আর দৃঢ়মূল হতে পারে না। মূল্যবোধ জীবনাশ্রয়ী হয়ে জাতির সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়লেই তবে জাতি অর্জন করে মহত্ত্ব আর মহৎ কর্মের যোগ্যতা। সবরকম মূল্যবোধের বৃহত্তর বাহন ভাষা তথা মাতৃভাষা, আর তা ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব লেখক আর সাহিত্যিকদের। ভাষার মারফত লেখক একদিকে যেমন নিজেকে প্রকাশ করেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করেন দেশ আর জাতিকেও। দেশ আর জাতির আশা-অভীপ্সা আর সব রকম চেতনাকে ভাষা দিয়ে শিল্প-কর্মে রূপান্তরিত করা লেখকের প্রধানতম দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের বেলায় যেমন দেখা দেয় স্বাধীনতার প্রশ্ন তেমনি দেখা দেয় এ দায়িত্বের পরিধি সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা।

॥ দুই ॥

লেখকের দায়িত্ব কি শুধু নিজেকে অপ্রকাশ করায় সীমাবদ্ধ? তা নয় বলেই স্বাধীনতার প্রশ্নও এ-প্রসঙ্গে অপরিহার্য। লেখক আর সাহিত্যিকরা সমাজে সবরকম মানসিক আর নৈতিক সম্পদের রসদ যেমন যোগান, তেমনি যুগপৎ তারা সে-সব সম্পদের ভাণ্ডারও। সমাজ-জীবনে সবরকম মননশীলতার ঐতিহ্য তাঁরাই রক্ষা করেন, রাখেন বাঁচিয়েও বর্তমানের জন্য শুধু নয়, ভবিষ্যতের জন্যও। এ প্রসঙ্গে ট্রাওয়াসেলের মন্তব্য:

Each generation is trustee to future generations of the mental and moral treasure that man has accumulated throughout the ages.

পরিমাণ আর গুণগত তারতম্য থাকতে পারে। কিন্তু কোন সমাজই এ ঐতিহ্যের সম্পদ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত নয়। সমাজের সংস্কৃতি আর মননশীলতার যা কিছু সম্পদ, তা রক্ষা আর বহন করার দায়িত্ব লেখক আর শিল্পী-সাহিত্যিকদের। কিন্তু তাঁদের যদি পুরোপুরি স্বাধীনতা না থাকে, তা'হলে সমাজের প্রতি এ মহৎ দায়িত্ব তাঁরা কি করে পালন করবেন ? লেখক যাকে সংস্কৃতির সম্পদ মনে করেন, রাষ্ট্র বা সামাজিক শক্তি যদি পোষণ করে তার বিপরীত ধারণা তখন ঘটে লেখকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। ঘটলে লেখক হিসেবে তার যে দায়িত্ব অর্থাৎ সমাজে সাহিত্য আর সংস্কৃতিচর্চার ধারাকে অব্যাহত রাখা, তা আর তাঁর দ্বারা সম্ভব হয় না কিছুতেই।

সাহিত্য আর সংস্কৃতি বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়—সমাজে মননশীলতার আয়ু আর সমৃদ্ধি নির্ভর করে এ সবের পূর্বাপর ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখার উপর। এ ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন একমাত্র লেখকরাই। সব দেশে, সব যুগে একমাত্র তাঁরাই এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন, পালন করে এসেছেন। টি. এস. এলিয়টের মতে : **The continuity of a literature is essential to its greatness.** তিনি এ প্রসঙ্গে এও বলেছেন : সাধারণত: দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ অগণিত অপ্রধান লেখকরাই এ ধারাবাহিকতা রক্ষা করে থাকেন এবং তাঁরাই রচনা করেন বড় লেখক জন্মাবার অনুকূলে, পরিবেশেও। কাজেই অপ্রধান লেখকদের ভূমিকাও তুচ্ছ করবার নয় মোটেও।

সবরকম সংস্কৃতি সাধনার প্রধান বাহন সাহিত্য। কোন কারণে যদি সাহিত্যের তথা লেখার স্রোত বন্ধ হয়ে যায়, তা'হলে সমাজের সবরকম মননশীলতার ধারাও রুদ্ধ হয়ে আসবে অচিরে। তখন কোন-না-কোন সংস্কারের অচলায়তনে সমাজও আটক পড়ে পরিণত হবে গতিহীন স্থাণুতে। সমাজকে সচল, সজীব আর সচেতন রাখার জন্যই সাহিত্য আর সবরকম মননশীলতার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। আল্লামা ইকবাল একটি চমৎকার উক্তি করেছেন। প্রতিমার সামনে জাগ্রতচিত্ত কাফের কাবার ভিতর ঘুমিয়ে থাকা নিষ্ঠাবান মুসলমানের চেয়ে অনেক ভালো। ব্যক্তির জন্য যেমন, তেমনি সমাজের জন্যও এ জাগ্রত-চিত্ততা অত্যাবশ্যক। কিন্তু প্রশ্ন : সমাজকে, সমাজের মানুষের চিত্তকে

কে জাগিয়ে রাখবে ? কে জাগিয়ে রাখতে পারে ? জাগ্রতচিত্ততার খোরাক যোগাতে পারে কে বা কারা ? বলা বাহুল্য, এসব প্রশ্নের একমাত্র উত্তর : লেখক আর তাঁর রচনা অর্থাৎ সাহিত্য। কাজেই লেখক আর তাঁর রচনার পথে কোন বাধা না থাকাই উচিত। কালচার বা সবরকম সংস্কৃতির এক প্রধান শর্ত পরমতসহিষ্ণুতা, ভিন্নমত ও ভিন্নপথ—অন্য ক্ষেত্রের মতো সাহিত্যেও থাকতে পারে এবং থাকা উচিত, অধিকন্তু তা স্বাস্থ্যপ্রদও। মনে-প্রাণে এ-নীতি মেনে না নিলে সাহিত্যের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে পারে না। সমাজ আর রাষ্ট্র যদি তার মতামতের রোলার সাহিত্যের উপর চালাতে শুরু করে, তা'হলে সাহিত্য শুধু নয়, সমাজও হয়ে পড়বে অচল আর অথর্ব। তাবৎ সভ্য দেশের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, আগে চিন্তা আর মননশীলতা, পরে তার পথ বেয়ে দেখা দেয় ব্যবহারিক উন্নতি আর সমৃদ্ধি। অর্থাৎ আগে চিন্তা পরে কর্ম ; আগে কল্পনা পরে বাস্তবায়ন। সবরকম সমৃদ্ধির এ-ই ইতিহাস।

কাজেই যাঁরা চিন্তা ও কল্পনা করেন আর সে চিন্তা আর কল্পনাকে দেন ভাষা, তাঁরা যদি অবাধে চিন্তা আর কল্পনা করতে আর তাকে ভাষা দিতে বাধা পান, তা'হলে সমাজ ভাব বা আইডিয়া পাবে কোথায় ? আবেগ আর অনুভূতির আস্বাদ পাবে কি করে ? তেমন অবস্থায় চিন্তা আর কল্পনার বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে সমাজ কি থাকবে না চিরবঞ্চিত ? অতএব লেখকের স্বাধীনতা যে শুধু লেখকের জন্য প্রয়োজন তা নয়, সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের জন্যও তা অত্যাবশ্যক। ভাষার স্বাধিকারের সঙ্গে লেখকের স্বাধিকারও থাকা চাই। এবারকার একুশে ফেব্রুয়ারীতে একথাগুলি আরো বেশী করে স্মরণীয়। এ কারণে যে লেখকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের আশংকা এর মধ্যে আবার নতুন করে দেখা দিয়েছে।

মুক্তবুদ্ধির দিশারী : কাজী আবদুল ওদুদ

রোগ আর বার্ধক্যের সঙ্গে দীর্ঘ সংগ্রামের পর কাজী আবদুল ওদুদ মারা গেলেন (১৯৭০)। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে শুধু যে একটা মহৎ ব্যক্তিত্বের অন্তর্ধান ঘটলো তা নয়, মহৎ চিন্তা-ভাবনার এক অত্যুজ্জ্বল দীপশিখাও নিভে গেল চিরতরে। এ-যুগে চিন্তাশীল আর মহৎ ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ আর সে সবের অনুশীলনে অনলস সাহিত্য-কর্মী বিরল বল্লেই চলে। এ উষর বিরলতার মাঝে কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন এক উর্ধ্ব-শির ও অনন্য ব্যতিক্রম। সাহিত্য-জীবনের সূচনা থেকে মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তাঁর ভূমিকা ছিল মুক্ত বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তার অনুশীলন, আর তাতে ছিলেন তিনি সারাজীবন আত্মনিবেদিত। মূল্যবান সাহিত্যকর্ম ছাড়াও তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ—সাহিত্য সমাজ স্বল্পায়ু ছিল তাতে সন্দেহ নেই, মুক্তবুদ্ধির যে সামুদ্রিক হাওয়া তা একদিন বইয়ে দিয়েছিল তরুণ মুসলিম বুদ্ধিজীবী মহলে, তার কোন তুলনা নেই। আজো তার তরঙ্গাঘাত স্বাধীন চিন্তায় বিশ্বাসীদের মন থেকে মুছে যায়নি। আমি অন্যত্র বলেছি মুসলিম সাহিত্য-সমাজের কর্মযোগী ছিলেন মরহুম আবুল হোসেন, কিন্তু ভাবযোগী ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ। তিনি জোগাতেন চিন্তা আর ভাব, চিন্তা ছিল তাঁর প্রতিমুহূর্তের ধ্যান-জ্ঞান।

ইংরেজীতে Thinker বলতে যা বুঝায় আমাদের সমাজে তিনি ছিলেন তাই। আর মহৎ জীবনের প্রতি ছিল তাঁর এক প্রবল আকর্ষণ। মহৎ ব্যক্তিত্ব আর তার বৃত্তরেখায় বিচরণ ছিল তাঁর প্রিয়তম ব্যসন।

ইতিহাসের তিন মহৎ ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল অদম্য—এঁদের জীবন, শিক্ষা আর রচনা ছিল তাঁর সারা জীবনের অধ্যয়নের বিষয়।

এ ছিল তাঁর পক্ষে একাধারে যেন পথ্য ও আহার্য—ততোধিক এক উপভোগ্য সম্পদ। এ তিনজন : হযরত মোহম্মদ (দঃ), মহাকবি গ্যেটে আর রবীন্দ্রনাথ। এর বাইরে তাঁর প্রিয় ছিল রামমোহন, তাঁর যুগে যিনি ছিলেন সবচেয়ে প্রগতিবাদী আর সর্বসংস্কারমুক্ত। তদুপরি জ্ঞানের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম আগ্রহ। বলাবাহুল্য সে জ্ঞান স্ব-ধর্মে ও স্ব-জাতিতে সীমিত ছিল না। জ্ঞান আর বিদ্যার প্রতি কাজী আবদুল ওদুদেরও ছিল এ দৃষ্টিভংগি। অন্য তিন জনের সঙ্গে যেমন তেমনি রামমোহনের সঙ্গেও তিনি মনের একটা সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। তাই রামমোহনও তাঁর অনুশীলনের বিষয় ছিল।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যখন মুসলমান রাজকর্মচারীরা সবাই কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে আসছেন, তখন তিনি আমাকে কলকাতা এক চিঠিতে লিখেছিলেন : "আমার ইচ্ছা হযরত মোহাম্মদ (দঃ), গ্যেটে আর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনটি বই লেখা। এ সবের উপকরণ এখানে যত সহজলভ্য হবে, ঢাকায় তা হওয়ার নয়। তাই আমি এখানে রয়ে গেলাম।" সুখের বিষয় তাঁর সংকল্পিত বই তিনটি তিনি লিখে যেতে পেরেছেন। হযরত মুহম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে বইটা তিনি শেষের দিকে লিখতে শুরু করেন, তখন তাঁর দৈহিক আর মানসিক শক্তিতে নেমে এসেছে ভাটা। তাই ওটা খুব বৃহদাকার হয়নি। অন্য দুইটি বেশ বড়, প্রত্যেকটা দুই খণ্ডে সমাপ্ত। তবে হযরতের (দঃ) জীবনী লেখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমগ্র কোরআনে তরজমাও করেন। তাও দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বিশ্বাস কোরআনে আলোর ছাড়া হযরত আর হযরতের জীবনকে পুরোপবি বুঝা সম্ভব নয়। এ'দুটোকে তিনি পরস্পরের পরিপূরক মনে করতেন। তাই এ দুই দায়িত্ব অর্থাৎ হযরতের জীবনী আর কোরআনের অনুবাদ এক সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। এজন্য বৃদ্ধ-বয়সে যথেষ্ট শ্রম তিনি স্বীকার করেছেন। তখন তাঁর বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে। মনে হয় আমাদের সমাজে এও এক বিরল দৃষ্টান্ত। হযরত-জীবনের সৌন্দর্য আর অপূর্ব মনুষ্যত্ববোধের প্রতি তাঁর আকর্ষণ আযৌবনের। কবি না হলেও যৌবনে একবার চমৎকার এক কবিতায় হযরতের প্রশস্তিও রচনা করেছিলেন তিনি। তার প্রথম স্তবকটি এখানে উদ্ধৃত হলো :

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বদনেতে, চরিতে তোমার হে মহান হে নরগৌরব।
মরুভূমে মরূদ্যান, ভীমকান্ত ভীম দরশন তব—উৎসারিত আত্মার সৌরভ।
যারা যত দীনহীন অন্ধ, পঙ্গু, মূক, দিশাহারা, জন্ম তব তাহাদেরি ভিতে;
জড়তার রূঢ় স্পর্শ অন্ধকারে বজ্রদীপ্ত তুমি—জয় গায় কবি মুগ্ধ-চিতে।

অত্যন্ত সৎ চিন্তাশীল লেখক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যে অত্যন্ত স্নেহ করতেন শুধু তা নয়, আন্তরিক শ্রদ্ধাও করতেন। তাঁকে দিয়ে বিশ্বভারতীতে নিজাম বক্তৃতা দেওয়া ব্যবস্থা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ আর সে বক্তৃতামালা প্রকাশিতও হয়েছিল বিশ্বভারতী থেকে। সে বক্তৃতামালার নাম ছিল 'হিন্দু মুসলমানের বিরোধ'। এ বক্তৃতা দেয়া হয় ১৯৩৫-এ। সেদিন এ বিরোধ এক ভয়াবহ রূপ নিয়েছিলো—দেশে তখন এমন কোন চিন্তাবিদ ছিলেন না, যাঁকে এ বিরোধ ভাবিত ও বিচলিত করেনি। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ আর কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন সমভাবে ভাবুক আর সম-চিন্তার শরীক। ঐ বক্তৃতামালার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ কাজী আবদুল ওদুদ সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কবির সে নাতিদীর্ঘ ভূমিকাটি এখানে উদ্ধৃত হলো :

"এ দেশে হিন্দু-মুসলমান বিভীষিকায় মন যখন হতাশ্বাস হয়ে পড়ে, এই বর্বরতার অন্ত কোথাও ভেবে পাই না, তখন মাঝে মাঝে দূরে দূরে সহসা দেখতে পাই দুই বিপরীত কূলকে দুই বাহু দিয়ে বাঁধবার চেষ্টা করছে একটি সেতু। আবদুল ওদুদ সাহেবের চিত্তবৃত্তির ঔদার্য সেই সঙ্গে মিলনের একটি প্রশস্ত পথরূপে যখন আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছে তখনি আশান্বিত মনে আমি তাঁকে নমস্কার করেছি। সেই সঙ্গে দেখেছি তাঁর মননশীলতা, তাঁর পক্ষপাতহীন সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, বাংলাভাষায় তাঁর প্রকাশ-বিশিষ্টতা। তাই একদিন সমাদরপূর্বক তাঁকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে আহ্বান করেছি, অনুরোধ করেছি বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনে বক্তৃতা করবার জন্যে। আমার আগ্রহপ্রত্যাশা ক্ষুণ্ন হয়নি, এই আনন্দটুকু জানাবার অভিপ্রায়ে আমার এই কয়টি ছত্র লেখা।"

রবীন্দ্রনাথ যখন আর নেই তখনো বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে বক্তৃতা দেয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তাঁকে। সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে, ১৯৫৫-৫৬-এ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার জাগরণ সম্বন্ধে বিশ্বভারতীতে তিনি ছ'টি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সে বক্তৃতামালাই 'বাংলার জাগরণ' নামে প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বভারতী থেকে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শরৎ-বক্তৃতাও দিয়েছেন, যা পরে 'শরৎচন্দ্র ও তারপর'-এ নামে প্রকাশিত হয়েছে।

মৃত্যুর মাত্র মাসখানেক আগে (১৬-৪-৭০) সংক্ষিপ্ত এক চিঠিতে তিনি আমাকে জানিয়েছেন, এবার তাঁকে শিশিরকুমার পুরস্কার দেয়া হয়েছে। এ পুরস্কার নাকি দেয়া হয় 'মনস্বিতার জন্য।' সে-প্রসঙ্গে

যোগ করেছেন। সভায় যেতে হয়ত চেষ্টা করব। সে চেষ্টা আর তাঁকে করতে হলো না। তাঁর মৃত্যু এত সন্নিকট, এ বোধ করি, তিনিও ভাবতে পারেননি। চিঠিতেই জানিয়েছেন তিনি এবার স্মৃতিকথা লেখা শুরু করেছেন। খুব স্থবির হয়ে পড়েছিলেন, হাতের লেখা এত এলোমেলো আর অস্পষ্ট হয়ে জড়িয়ে যেতো যে তাকে কোন মতেই তাঁর হাতের লেখা বলে উদ্ধার করা যেতো না। আমরা যারা তাঁরা হাতের লেখা পড়ায় অভ্যস্ত তারাও চিঠির সবটা পড়তে পারতাম না। তাঁর হাতের লেখা মোটেও সহজপাঠ্য ছিল না। অভ্যস্তরা ছাড়া পাঠোদ্ধার প্রায় অসম্ভব ছিল। একবার বসুমতী সম্পাদককে তিনি এক চিঠি লিখেছিলেন, সম্পাদক তখন অফিসে উপস্থিত ছিলেন না। ফিরে এলে সহকর্মী চিঠিটা বাড়িয়ে দিয়ে বল্লেন: দেখেন কোথা থেকে আপনার নামে একটা উর্দু চিঠি এসেছে। সম্পাদক চিঠি হাতে নিয়ে বল্লেন: কোথায় উর্দু? এতো ওদুদ সাহেবের চিঠি, খাঁটি বাংলায় লেখা। কলকাতা সাহিত্যিক মহলে এ গল্পটা নাকি অনেকদিন চালু ছিল।

কাজী আবদুল ওদুদের সাহিত্যজীবন সুদীর্ঘ, গোটা একটা জীবন জুড়ে রয়েছে তার ব্যাপ্তি। ফসলের বৈচিত্র্যে এ সাহিত্য এত সমৃদ্ধ যে, তার তুলনা মেলা ভার। প্রথম জীবনে তিনি গল্প-উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছিলেন—তার পরিচয় বহন করছে 'মীর পরিবার' আর 'নদীবক্ষে।' পরে তিনি—ঝুঁকে পড়েন মননশীল রচনার দিকে—যার অনিবার্য বাহন প্রবন্ধ। প্রবন্ধে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের নিদর্শন 'শাশ্বত বঙ্গ'—যাতে স্থান পেয়েছে ছোট-বড় প্রায় পঁচাত্তরটি রচনা। এটি ছোট-খাটো একটি বিশ্বকোষ। এর বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য দেখলে অবাক হতে হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রকাশশক্তির বিশিষ্টতার উল্লেখ করেছেন। এ বিশিষ্টতা যে কতখানি বিশিষ্ট, উদ্ধৃতি ছাড়া তা বুঝানো যাবে না। এ বিশিষ্টতা শুধু ভাষা বা আঙ্গিকের বিশিষ্টতা নয়—চিন্তা, মনন আর দৃষ্টিভঙ্গিরও বিশিষ্টতা।

(ক) ইসলামে রাষ্ট্রের ভিত্তি কি—আইনজ্ঞেরা তার উত্তর দিতে চেষ্টা করবেন কোরআন-হাদিস আর মুসলিম ইতিহাস মন্থন করে। কিন্তু যিনি জানেন, মুসলমান হওয়ার অর্থ আল্লাহর অর্থাৎ সত্য ও কল্যাণের অনুগত হওয়া আর সেইজন্য জগতের বন্ধু হওয়া। এখানে ওদুদ সাহেব দু'টি

হাদিস উদ্ধৃত করেছেন ফুটনোটে। হাদিস দু'টি এই: (১) জগৎ আল্লাহর পরিবার। সে-ই আল্লার কাছে ভাল যে তাঁর পরিবারের প্রতি ভালো। (২) যে আল্লাহতে বিশ্বাসী নয়, আর যার আঘাত থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় তিনি মুসলমান নন্—ইসলামে রাষ্ট্রের ভিত্তি কাণ্ডজ্ঞান ও মানব-হিত।

(খ) সক্রেটিসদের বাদ দিয়ে মানুষের সভ্যতা অনেকখানি অর্থশূন্য একথা সক্রেটিসরা তো জানেনই আর দশ জনেরও মনে রাখা মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল। কেননা, সার্থক সভ্যতা তাই যা বস্তুতে সমৃদ্ধ আর মানসচেতনায় বিশেষভাবে সমৃদ্ধ।

—ব্যক্তির স্বাধীনতা

(গ) কিন্তু সত্যের আঘাত বড় প্রচণ্ড। মুসলমানের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের গতানুগতিকতাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে নবসৃষ্টির প্রয়োজন ও সম্ভাবনা দেখিয়ে মুসলমান সমাজের বুকে কামাল যে সত্যকার আঘাত দিয়েছেন, আশা করা যায়, এই আঘাতেই আমাদের শতাব্দীর মোহ-নিদ্রার অবসান হবে।

ধর্ম-কর্মেজাতীয়তায়, সাহিত্যে, সমস্ত ব্যাপারেই আমাদের ভিতরে স্থান পেয়েছে যে জড়তা ও দৃষ্টিহীনতা, মনে আশা জাগছে, যেমন করেই হোক, এইবার তার অবসান আসন্ন হয়ে এসেছে। কামালের প্রদত্ত এই আঘাতের বেদনাতেই হয়তো আরো উপলব্ধি করতে পারবো সত্যকার ধর্ম-জীবন কি, জীবনের সঙ্গে শাস্ত্রের সত্যকার সম্বন্ধ কি। হয়তো আরো উপলব্ধি করতে পারবো জীবন-সমস্যার চরম সমাধান কোনকালেই হয়ে যায়নি, নূতন করে সে-সমস্ত বিষয়ে সচেতন হওয়া আর তার মীমাংসা করতে চেষ্টা করাই জীবন।

আর এই বেদনাময়, আনন্দময় উপলব্ধির বহু ভঙ্গিমচ্ছটায় অনুরঞ্জিত হবে আমাদের যে আত্মপ্রকাশ চেষ্টা, তারই থেকে উৎসারিত হবে আমাদের সত্যকার সাহিত্য।

—মুস্তাফা কামাল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

নবপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের সামনে—মুসলিম সাহিত্য সমাজ আর তার মুখপত্র 'শিখার' মারফত তিনি এ বাণীটি তুলে ধরেছিলেন: জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট,

মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' কাজী আবদুল ওদুদের সমগ্র রচনারও মূল সুর এটি। তিনি আজ নেই কিন্তু তাঁর বাণীটি বেঁচে আছে, থাকবে। এছাড়া সভ্য আর সমৃদ্ধ জীবন আশা করা যায় না। বিদেশের জন্য এ হয়তো তেমন নতুন কথা কিছু নয়, কিন্তু আমাদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন—এ এক নতুন আলোকবর্তিকা। বিশেষ করে এখন যেভাবে বিচারহীন ধর্মান্ধতা বেড়ে চলেছে তাতে এ বাণীটির প্রয়োজন আরো বেশী করে দেখা দিয়েছে।

আমরা যারা মুসলিম সাহিত্য-সমাজ আর 'শিখার' সঙ্গে কিছুটা জড়িত ছিলাম তাদের সকলের চিন্তার উপর কাজী আবদুল ওদুদের প্রভাব লক্ষ্যগোচর। তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল ব্যক্তিগত এবং অত্যন্ত আন্তরিক। তাঁর তিরোধানে আমাদের জীবনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো তা কখনো পূরণ হওয়ার নয়। তাঁর সাহিত্যের মতো তাঁর জীবনটাও ছিল মার্জিত, পরিশীলিত আর পরিমিতিবোধে সংযত ও সংহত। যদিও তাঁর শেষজীবন কিছুটা ভিন্ন ও অনাত্মীয় পরিবেশে কেটেছে, কিন্তু কখনো তাঁর সহজাত সম্মান আর মর্যাদাবোধকে তিনি ক্ষুণ্ণ হতে দেননি। শুনেছি সেখানেও তিনি সব সময় গুণীজনের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। দেশ, ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি সব বিষয়ে তাঁর ধ্যান আর বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তার আলোকপাত ঘটেছে। সে চিন্তার সঙ্গে এখনকার পাঠকদের পরিচয় ঘটলে দেশ লাভবান হবে।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ঃ স্মৃতিচারণ

॥ এক ॥

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অনন্য ব্যক্তিত্ব আমাদের চোখের সামনে থেকে চিরতরে সরে গেছে। কিন্তু মন থেকে মুছে যেতে দীর্ঘ সময় লাগবে। তাঁর ব্যক্তি-জীবন আর সাধনা কোনটাই সহসা ভুলে যাওয়ার মত নয়। দুই-ই অসাধারণ এবং অবিস্মরণীয়। তাঁর সঙ্গে কোনদিক দিয়েই আমাদের মিল ছিল না। আমার সঙ্গে তো রীতিমত বিরোধই ছিল। আমি ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের বুদ্ধির মুক্তি-আন্দোলনের আওতা আর আবহাওয়ার মানুষ। নানা সংশয় আর জিজ্ঞাসায় আমাদের মন আলোড়িত। এ সংশয় আর জিজ্ঞাসা ধর্ম আর শাস্ত্রের নিষিদ্ধ এলাকায়ও হানা দিতে দ্বিধাহীন। কিন্তু শহীদুল্লাহ্ সাহেব ছিলেন এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে বিশ্বাসী, প্রত্যয়ী এবং একান্তভাবে আচারনিষ্ঠ। দেশ-বিদেশ ঘুরেছেন, জ্ঞানের বিচিত্র পথে করেছেন অবাধে বিচরণ, যার বেশীর ভাগই বলা যায় ধর্মনিরপেক্ষ বা সিকুলার। তবুও ধর্ম আর বিশ্বাসের ব্যাপারে তাঁর মনে কখনো দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অনুপ্রবেশ ঘটেনি। এমন লোক সাধারণত কিছুটা সংকীর্ণ আর অসহিষ্ণু হয়ে থাকে। আশ্চর্য, শহীদুল্লাহ্ সাহেব কিন্তু তা ছিলেন না। তিনি আশ্চর্যরকম উদার আর পরমতসহিষ্ণু ছিলেন।

ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, শিল্প, শিক্ষা ইত্যাদি প্রায় প্রতি বিষয়েই তাঁর সঙ্গে আমার মতবিরোধ ছিল। একবার ত সংবাদপত্রে তাঁর বিরুদ্ধে বেনামীতে আমি এক প্রবন্ধও লিখে বসেছিলাম। তাতে তাঁর প্রতি যথেষ্ট কটূক্তি ও আক্রমণ ছিল। এমনিতেও বন্ধুমহলে তাঁকে নিয়ে আমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ কম করতাম না। তিনি ছেলেমেয়েদের অতিরিক্ত

একটা বাংলা নাম রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। ফলে নেপথ্যে ছেলেরা তাঁর নামটার বাংলা করে নিয়েছিল কবিরাজ বলিনারায়ণ। ডক্টর হলো কবিরাজ, শহীদ বলি, আর উল্লাহ বা আল্লাহ্ নারায়ণ। এসব যে তাঁর কানে যেত না বা তিনি জানতেন না, তা নয়। পণ্ডিতরা কিছু বোকা আর উদাসীন হয়ে থাকে এমন একটা বিশ্বাস সাধারণ্যে চলতি; কিন্তু শহীদুল্লাহ্ সাহেব ছিলেন এ চলতি বুলির সাক্ষাৎ প্রতিবাদ। শেষবারের মতো রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত সচেতন, বুদ্ধিমান আর সব বিষয়ে ওয়াকিফহাল ছিলেন। নিজ বিশ্বাস আর প্রত্যয়ে তিনি অটল, অনড় ছিলেন বটে, কিন্তু চারদিকের ঘটনা আর ভাবনা-চিন্তা থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। ছিলেন না দেশ ও সমাজের কোন সমস্যার প্রতি উদাসীন। শিক্ষা তাঁর মনের একটি বড় স্থান দখল করেছিল, শিক্ষাসম্প্রসারণ সহজ ও দ্রুত হবে মনে করে তিনি সহজ শিক্ষা, সহজ বাংলা ইত্যাদি কথা বলতেন বার বার, নানা অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে। এ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন, লিখতেন পত্র-পত্রিকায়। এখানেও তাঁর সঙ্গে আমার বিরোধ ছিল। সহজ শিক্ষায় আমার বিশ্বাস আগেও ছিল না, এখনো নেই। একবার ত এক সভায় তাঁর সামনেই আমি বলে ফেলেছিলাম—সহজ শিক্ষায় অধ্যক্ষ তৈরী হতে পারে, কিন্তু ডক্টর শহীদুল্লাহ্ কখনো হতে পারে না! কথাটা আমি অন্য এক প্রবন্ধেও বলেছি। বেসিক ইংরেজীর কথা অনেকে বলেন, শহীদুল্লাহ্ সাহেবও বলতেন। কিন্তু কথা হচ্ছে বেসিক ইংরেজী কার জন্য? ইংরেজী যার মাতৃভাষা নয়, তার জন্যই। তেমনি যার মাতৃভাষা বাংলা নয়, তার জন্য বেসিক বা সহজ বাংলা চল্লেও চলতে পারে। কিন্তু বাঙালী ছেলের শিক্ষার বাহন তা হতে পারে না। বেসিক ইংরেজী বা বেসিক বাংলা দিয়ে কোনরকম মননশীল ক্রিয়া-কর্ম চলতে পারে বলে আমার বিশ্বাস নয়।

আমি যে সর্বতোভাবে তাঁর মতাদর্শের বিরোধী, তা শহীদুল্লাহ্ সাহেব ভালো করেই জানতেন। আমার মতিগতি, আচার-আচরণ কিছুই তাঁর অজানা ছিল না। তবুও দেখে আশ্চর্য হতাম, যখনই তিনি চাটগাঁ আসতেন, আমার বাসায় এসে আমাকে না দেখে কখনো যেতেন না। অন্য কথা বাদ দিলেও তিনি আমার চেয়ে অনেক বেশী বয়োবৃদ্ধ, কাজেই আমার লজ্জার অন্ত থাকতো না। বারবার সানুনয়ে বলেছি—আপনি কাউকে দিয়ে খবর পাঠাবেন, আমি গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা

করে আসবো। কিন্তু বাস্তবে তা কখনো ঘটেনি, প্রতিবারই তিনি নিজে এসে দেখে যেতেন আমাকে, নতুন কোন বই প্রকাশিত হলে তা দিয়ে যেতেন নিজের হাতে নাম লিখে। অথচ আমার কোন বই তাঁকে আমি এভাবে দিয়েছি বলে মনে পড়ে না। ঢাকায় ত কতবার গিয়েছি তাঁর জীবদ্দশায়, একবারও ত মনে হয়নি বাসায় গিয়ে এ পরম ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু, স্নেহপ্রবণ, জ্ঞান-সাধককে সালাম জানিয়ে আসা উচিত। এ মহাপণ্ডিতের সঙ্গে এই ছিল আমাদের তফাৎ। গুড ওল্ড ডে'জ বলতে যা বুঝায় শহীদুল্লাহ্ সাহেব ছিলেন তার এক সাক্ষাৎ মূর্তি আর প্রতীক।

।। দুই ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্য পত্রিকার' একটি শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা সংখ্যা বের করা হয়েছিল। ভাইস-চ্যান্সেলারের সভাপতিত্বে খুব ঘটা করে এক অনুষ্ঠান করে তা শহীদুল্লাহ সাহেবকে দেয়া হয়েছিল উপহার। কাগজে এ সংবাদ পড়ে আমরা খুব আনন্দিত হলাম, যা হোক এতদিন পরে এ জ্ঞানবৃদ্ধ শিক্ষক আর পণ্ডিতজনকে একটুখানি শ্রদ্ধা দেখানো হল। দূর থেকে নিজেরাও কিছুটা অপরাধ-মুক্তি যেন অনুভব করলাম। কিন্তু সাহিত্য পত্রিকার সে সংখ্যাটা দেখে আমি অত্যন্ত অবাক হয়ে গেলাম। শহীদুল্লাহ্ সাহেবের একটি ছবি ছাড়া সারা পত্রিকায় কোথাও তাঁর সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ, কোন আলোচনা, কিছুই স্থান পায়নি। মুখপাতে তাঁর এক ছবি, অন্তিমে তাঁর এক বই-এর সামান্য রিভিয়ূ—এই নিয়ে বিরাট সাহিত্য পত্রিকার শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা সংখ্যা! দেখে আমি শুধু অবাক হলাম না, হতাশা আর বিরক্তিতে আমার প্রায় ধৈর্যচ্যুতি ঘটার দশা, এভাবে বাঁ হাতে শ্রদ্ধা নিবেদনের কি অর্থ? শহীদুল্লাহ্ সাহেবের সুদীর্ঘ জীবন আর সাধনার এত দিক রয়েছে, সে সম্বন্ধে কেউ কি কিছু আলোচনা করতে পারলেন না? তাঁর সহকর্মীদের কেউ কেউ আজো বেঁচে আছেন, তাঁর প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে গুণী আর সুলেখকের অভাব নেই, তাঁরা অন্তত স্মৃতি-চারণও ত করতে পারতেন। সত্যই আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো, আমি প্রতিবাদ না করে পারলাম না। আমার সেই সুদীর্ঘ প্রতিবাদ 'পরিক্রম' পত্রিকায় প্রকাশিত হলো ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬-তে।

এটি প্রকাশিত হওয়ার পর আমার হঠাৎ খেয়াল হলো যদিও আমি শহীদুল্লাহ্ সাহেবের ছাত্র কিংবা কাছাকাছির মানুষ ছিলাম না

আর তাঁর সাহিত্য ও জ্ঞান-সাধনার সঙ্গে আমার তেমন পরিচয়ও নেই; বরং বলা যায় তাঁর সাহিত্য থেকে আমার সাহিত্য সম্পূর্ণ আলাদা—দু'য়ের মধ্যে কিছুটা বিরুদ্ধতাও যে নেই, তা নয়। তবুও তাঁর সম্বন্ধে আমার নিজেরও ত কিছু জানাশোনা আছে। দূর থেকে তাঁকে, তাঁর জীবন আর সাধনা আমিও ত দেখেছি—তাঁর সম্বন্ধে গভীর না হলেও কিছুটা পরিচয় আমারও ত রয়েছে। তখন মনো হলো: আমি নিজে কিছু লিখি না কেন? আমি যেটুকু জানি, তাঁর সম্বন্ধে আমার যা ধারণা তা নিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ ত সহজেই হতে পারে। আমি তাঁর বিভাগের ছাত্র ছিলাম না বটে, কিন্তু আমরা যখন ছাত্র, তখন ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তখন সাক্ষাৎ ছাত্র না হলেও বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কলেজের সব অধ্যাপককে শিক্ষক হিসেবে শ্রদ্ধা করার রেওয়াজ ছিল। শহীদুল্লাহ্ সাহেবকেও আমরা সেভাবে শ্রদ্ধা করতাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমিত কর্তব্যগণ্ডির বাইরে আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি আর গবেষণার বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাঁর যে বিচরণ আর সে-সব ক্ষেত্রে তাঁর যে অবদান, তার জন্য অন্য সবার সাথে আমিও ছিলাম শ্রদ্ধাবনত। যাই হোক, এ ঝোঁকের মাথায় আমি তাঁর সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ একটি প্রবন্ধ লিখে 'পাকিস্তানী খবরে' পাঠিয়ে দিলাম। শহীদুল্লাহ্ সাহেব সম্বন্ধে তখনও কিছু লেখার রেওয়াজ দাঁড়ায়নি—তাই ছাপা সম্বন্ধে কিছু দ্বিধাও ছিল মনে। 'পাকিস্তানী খবরে' স্নেহ-ভাজন সুশোভন আনোয়ার আলী আছে ভরসা করে তাই লেখাটা ওখানেই পাঠালাম। উক্ত পত্রিকার বিশেষ ঈদসংখ্যায় লেখাটি ছাপা হলো শহীদুল্লাহ্ সাহেবের ছবিসহ। লেখাটি পড়ে শহীদুল্লাহ্ সাহেব আমাকে যে চিঠিখানি লিখেছিলেন তা দিয়েই এ স্মৃতিচারণ শেষ করলাম। আমার উক্ত লেখাটি ১৯৬৭-এ প্রকাশিত, পরে শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা গ্রন্থেও পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

পেয়ারা ভবন,
৭৯, বেগনবাজার রোড,
ঢাকা—১
৮।৪।১৯৬৬

পরম প্রীতিভাজন,

তসলীম। এই অধম সম্বন্ধে আপনি সম্প্রতি 'পাকিস্তানী খবরে' যে আলোচনা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমার আন্তরিক শোকরিয়া জানাই।

এখানে তিনি একটি আরবী বচন উদ্ধৃত করেছেন।

আরবী সে বচনটার অর্থ : "যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয় সে আল্লার প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়।" নিজের চেহারা আয়না ছাড়া দেখা যায় না। তবে সব আয়নায় যথাযথ দেখা যায় না এ কথাটাও ঠিক। একটা কথা জানতে ইচ্ছা হয়। আপনি কোন সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন এবং আমার ছাত্র ছিলেন কি না। আমাদের ইসলামী বিশ্বকোষ প্রায় সমাপ্ত। তবে কবে ছাপা হবে জানি না। আমি ভাল আছি। আশা করি আপনি কুশলে আছেন। ইতি —একান্ত ভবদীয়

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।

চট্টগ্রামের উপভাষা

বাংলাদেশের মানচিত্রের দিকে তাকালেই আমরা চট্টগ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান ও তার বৈশিষ্ট্য সহজেই বুঝতে পারবো। ভাষার উপর ভূগোলের প্রভাব সর্বজনস্বীকৃত। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা যে বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার ভাষা থেকে স্বতন্ত্র তার শব্দসম্ভারেও যে দেখা যায় বিচিত্র উপকরণ তার মূল কারণ এ-ভূগোল। স্থলপথে একটা সরু অঞ্চল দিয়েই শুধু চট্টগ্রামের সঙ্গে বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার সংযোগ রয়েছে। চট্টগ্রামের বাদবাকি অংশ বার্মা ও আসাম দ্বারাই পরিবেষ্টিত। চট্টগ্রাম-আসাম সীমান্তে রয়েছে দুর্ভেদ্য লুসাই পর্বতমালা। তাই আসামের সঙ্গে চট্টগ্রামের যোগাযোগ তেমন সহজ ও ব্যাপক হতে পারেনি। কিন্তু বার্মার সঙ্গে এ-বাধা ছিল না। জলপথে এবং স্থলপথে দুদিকেই বার্মা ছিল সহজগম্য। বার্মার উর্বরতা, প্রাচুর্য ও সহজে অর্থ উপার্জনের দরাজ সুযোগ-সুবিধা চিরকালই চট্টগ্রামবাসীকে আকর্ষণ করেছে। বার্মার প্রত্যন্ত জেলা আকিয়াবের সঙ্গে চট্টগ্রামের সম্পর্ক ছিল প্রায় পারিবারিক। সাধারণতঃ বৈষয়িক ও অর্থকরী দিকই মানুষকে সহজে আকর্ষণ করে। দেখা গেছে জীবিকার প্রয়োজনে মানুষ অনায়াসে দেশ, ধর্ম ও সমাজের গণ্ডী অতিক্রম করে যায় এবং বাঁধা পড়ে একই স্বার্থের বন্ধনে। এ বন্ধন স্বাভাবিক জৈব নিয়মে অনেক ক্ষেত্রে বৈবাহিক বন্ধনেও রূপান্তরিত হয়। ভাবের আদানপ্রদান ও বৈষয়িক আলাপ-আলোচনার জন্য একের ভাষা অন্যকে বুঝতে হয়, করতে হয় গ্রহণ। পারিবারিক ও বৈবাহিক সম্পর্ক হলে তা প্রায় অনিবার্য হয়ে পড়ে। এভাবে এক ভাষার শব্দ ও বাকভঙ্গী সহজে অন্য ভাষায় বিশেষ করে মুখের ভাষায় অনুপ্রবেশ করে। বার্মা ও আরাকানের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগের ফলে চট্টগ্রামের

উপভাষায় ওখানকার বহু শব্দ স্থান পেয়ে গেছে। তার উপর এক সময় চট্টগ্রাম বহুকাল ধরে আরাকান রাজাদের অধীন ছিল। শাসকদের ভাষার প্রভাব শাসিতের উপর নানা কারণে ব্যাপক ও অপ্রতিরোধ্য হতে বাধ্য। নজির হিসাবে মুসলমান শাসন ও ইংরেজ শাসনকালের কথা উল্লেখ করা যায়। ঐ দুই শাসনকালে এদেশের ভাষায় ব্যাপক ভাবে আরবী, ফার্সী ও ইংরেজী শব্দের যেভাবে অনুপ্রবেশ ঘটেছে আরাকানীদের শাসনকালেও যে অনুরূপভাবে আরাকানী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটবে তা সহজেই অনুমেয়। বলাবাহুল্য, আরাকানী ভাষা মূল বার্মা ভাষারই একটা অপভ্রংশ মাত্র। যেমন মূল বাংলাভাষার এক অপভ্রংশ চট্টগ্রামের উপভাষা।

ভৌগোলিক দিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চট্টগ্রামের অঙ্গ হলেও তার সঙ্গে সমতল চট্টগ্রামের দুস্তর ব্যবধান রয়েছে। এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকেরা নৃতত্ত্বের দিক দিয়েও পৃথক। হালে যারা ওখানে গিয়ে বসতি করছেন তাদের বাদ দিলে ওখানকার সব অধিবাসীই মঙ্গোলীয়। কিন্তু খাস চট্টগ্রামবাসীরা নৃতত্ত্বের দিক দিয়ে মিশ্রিত জাতি। মঙ্গোলীয়, সেমেটিক, আর্য, দ্রাবিড় সব রক্তই এদের দেহে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এমনকি ওলন্দাজপর্তুগীজ রক্তের ছিঁটেফোঁটাও এখানে দেখতে পাওয়া যায়। সমুদ্রের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে বলেই এ মিশ্রণ সহজ ও অবাধ হয়েছে।

বলাবাহুল্য, এসব মিশ্রণ জড়ভাবে হয়নি, মানবিক পথে ও সামাজিক নিয়মেই হয়েছে। তার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ভাষা ও বোধগম্য শব্দের। চট্টগ্রাম এভাবে বহু দেশ ও বহু জাতির শব্দ উপভাষার গা মিলিয়ে এক হয়ে গেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও জীবনযাপন পদ্ধতি সবই আলাদা, এমনকি উৎপাদনপ্রণালী আর অর্থনীতিও ভিন্ন। কিন্তু যতই ভিন্ন ও পৃথক হোক, সীমান্তনিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ও পণ্যবিনিময় না করে উপায় নেই। ফলে ভাবের আদানপ্রদান ও বাহন ভাষার ভূমিকা এসে পড়ে। এ-সব নানা কারণে যা মূলতঃ ভৌগোলিক চট্টগ্রামের উপভাষা মূল বাংলাভাষা থেকে পৃথক রূপ নিয়েছে এবং অন্যান্য জেলার ভাষা থেকেও হয়ে পড়েছে বিচ্ছিন্ন, একক ও বিশিষ্ট। ফলে চট্টগ্রামের নিরক্ষর জনসাধারণ ও অন্যান্য জেলার ভাষা অলেখ্য বাংলা যতখানি বুঝতে পারে চট্টগ্রামের বাইরের শিক্ষিত লোকেরাও চট্টগ্রামের উপভাষা ততখানি বুঝতে পারে না। অনেকে মোটেও পারে না।

ভূগোলের পরেই ইতিহাসের স্থান। ইতিহাসের বিচিত্র ধারা যুগে যুগে বহু জাতিকেই চট্টগ্রামে টেনে এনেছে। তার ফলে শুধু রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন ঘটেনি, ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও রূপান্তর ঘটেছে অবিশ্বাস্য ভাবে। মুসলিম বিজয়ের পূর্বে চট্টগ্রাম বেশ কিছুকাল ত্রিপুরা রাজের অধীন ছিল। ভাষার গায়ে তারও কিছু চিহ্ন থাকা অসম্ভব নয়।

আবহমানকাল থেকেই চট্টগ্রাম সামুদ্রিক বন্দর। সমুদ্রপথে পৃথিবীর প্রায় সব সমুদ্রগামী জাতি ও দেশের সঙ্গেই চট্টগ্রামের যোগাযোগ ঘটেছে দীর্ঘকালের। বাংলাদেশে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু আগে থেকেই এমনকি ঐতিহাসিকদের মতে অষ্টম—নবম শতাব্দী থেকেই চট্টগ্রাম বন্দরে আরব বণিকদের যাতায়াত শুরু হয়েছে। বন্দরের আশেপাশে বহু স্থানের নাম এখনো সে স্মৃতি বহন করছে। তারপর এসেছেন দরবেশ আউলিয়ারা ধর্মপ্রচার ও ধর্মসাধনা উপলক্ষে। তাঁরা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন। তাঁদের সাধনার শীর্ষস্থান করে নিয়েছেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি চট্টগ্রামকে। তাঁদের সহতা-সংপূত সুন্দর জীবন এ দেশের জনসাধারণকে তাঁদের প্রতি শুধু নয় ইসলামের প্রতিও আকর্ষণ করেছিল। এদের শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রচারের ফলে এদেশের ভাষায় বহু ইসলামী তথা আরবী ও পার্শী শব্দ যে ঢুকে পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যখন মুসলমানেরা চট্টগ্রাম জয় করেন তখন চট্টগ্রামে মুসলিম জনসংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। এ কারণে সায়েস্তা খাঁ-তনয় বুজুর্গ উমেদ খাঁর পক্ষে চট্টগ্রাম জয় ও চট্টগ্রামে দীর্ঘস্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা অত সহজ হয়েছিল এবং সহজ হয়েছিল চট্টগ্রামকে ইসলামাবাদে রূপান্তরিত করা। এর পর থেকেই এদেশের আঞ্চলিক ভাষায় আরবী-পার্শী শব্দের অনুপ্রবেশ অধিকতর দুর্বার ও ব্যাপক হয়ে পড়ে। চট্টগ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান আর তার ইতিহাসের বিচিত্র ধারা মনে রাখলে এদেশের আঞ্চলিক ভাষার বৈচিত্র্য ও দুরূহতার কারণ সহজেই উপলব্ধ হবে। কত দেশের কত জাতের কত ভাষার লোক এখানে এসে মিলিত হয়েছে। নতুন নতুন শব্দের সঙ্গে তাঁরা নিয়ে এসেছে, নতুন ভাবভংগী নতুন স্বরাঘাত, নতুন ইনটুনেনটেইনন, নতুন বাক্‌প্রয়োগ রীতি। তার ফলে চট্টগ্রামের উপভাষণ এমন এক রূপ নিয়েছে যে, যা বাংলা হয়েও বাংলা নয়। বাংলা বর্ণমালা দিয়ে তার যথাযথ ভাবভংগী প্রকাশ করা যায় না, এবং অধিকাংশ বাংলা ভাষাভাষীর কাছে এ ভাষা দুর্বোধ্য বল্লেই চলে। ফলে এ উপভাষায় কিছু কিছু বৃহত্তর পাঠকের উপযোগী সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়।

এক সময় চট্টগ্রামের উপভাষায় কিছু কিছু সাহিত্য যে রচিত হয়নি তা নয়। কিন্তু তখন মানুষের জীবন একটি নির্দিষ্ট গণ্ডী বা পরিবেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বিভিন্ন জেলার পাঠক বা বৃহত্তর দেশের কথা তখন মানুষ ভাবতে শিখেনি। তাদের রচনার উদ্দেশ্য ছিল নিজের আশে-পাশের গ্রাম, বড় জোর নিকটবর্তী থানা। এসব রচয়িতাদের কল্পনার দৌড় কখনও জেলা ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। তাঁদের রচনার বিষয়বস্তু ছিল গ্রাম্য—গ্রামের কোন বড় ঘটনা ; বড় রকমের খুন ; রহস্যময় মোকদ্দমা, মহামারী ; ঝড়-বন্যা বা অন্যরকমের দুর্যোগ বা স্বল্পপরিসর ও নিঃসঙ্গ গ্রাম্য জীবনে নিয়ে আসে ক্ষণিকের চাঞ্চল্য। এসব রচনার রচয়িতাদের প্রতিভা যেমন সীমিত তেমনি এদের লক্ষ্যও সীমিত। সাময়িকতার বেশী এসব রচনার অন্য কোন মূল্য নেই। এর আবেদনও তাই স্থান-কালেই আবদ্ধ। আমার ছোটকালে শোনা একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় গানের দুইটি লাইন মনে পড়ছে।

ও ভাই চঁড়িয়াতে নাই খুশী মারা গেইরে এয়াকুব দোভাষী। এয়াকুব দোভাষী চট্টগ্রামের এক প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে গ্রাম্য কবি এ গান রচনা করেছেন। চট্টগ্রামের বাইরের লোকের কাছে এ গানের কোন আবেদন নেই। এমন কি হালের চট্টগ্রামবাসীর কাছে এ গানের আবেদন ফুরিয়ে গেছে। কারণ এয়াকুব দোভাষী আজ বিস্মৃত নাম। হাতী-খেদাও চট্টগ্রামের একটি বৈশিষ্ট্য। এ হাতীখেদা সম্পর্কেও চট্টগ্রামের লোক-কবিরা বহু কবিতা, গাথা, গান রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের রচনার সঙ্গে সঙ্গে রচয়িতাদের নামও আজ হারিয়ে গেছে। হাতীখেদা সম্বন্ধে এক গাথা-কাব্যের কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত হলোঃ

হাতীর ঠেং দেইখতে যেন গুদামের থম।
মুড়ার পথ ও লাগত পাইলে হাতী মাইনষর যম।
উঁর উঁর কান যে'ন দুইয়ান কুলা।
দাঁতাল হাতীর দাঁত দুয়া মাঘ মাইস্যা মূলা।।
কেঁইরওয়ান ছোড়তা তার মাথা হামিসা হেট।
ছোড ছোড চোখ হাতীর ডোলের মতন পেট।।

এ যুগের চট্টগ্রামের বিখ্যাত কবিয়াল রমেশ শীলও চট্টগ্রামী ভাষায় কিছু কবিতা ও গান রচনা করেছেন। তাঁর একটা গানের কিছুটা অংশ উদ্ধৃত হলো :

আরে ও সুলতান্যার বাপ, দুঃখের খতা খইতাম আমার বান্ধব আছনি ?

ভাইরে পেট ভরি খাইত ন পারি গায়ের বল হৈল হানি
হারাদিন মজুরি করি দুয়া টেঁয়া আনি, হাডত গেলে
সওদা কইরতাম চোখের পরে পানি।
চনর দাম আসমান ছুইঁয়ে ঘরত নাই মোর ছানি।
আল্লা জানে কডে থাইক্যম বরিষা পইল্লে পানি।
মরিচের সের পাঁচ টেঁয়া ভাই এক ছড়াক লই কিনি
মরিচ পুড়ি ভাত খাইতাম, তওফিকে কুলায়নি' ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, এসব কবিতা বা গানেরও আবেদন আঞ্চলিক এবং স্থানকালে সীমিত। আমার বিশ্বাস চট্টগ্রামের কোন কোন উপভাষাতেই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য রচিত হতে পারে না। যে উপভাষণ দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের বোধগম্য নয় তাকে সাহিত্যের ভাষা করতে গেলে সাহিত্যকে খণ্ডিত, সংকীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন করা হয়। আঞ্চলিক চরিত্রের আকর্ষণ আর স্বাভাবিকতা বৃদ্ধি পায় সত্য, কিন্তু বৃহত্তর সাহিত্যের বাহন উপভাষা হতে পারে না। তাই চট্টগ্রামের লেখকদের ভাষাও প্রদেশের স্বীকৃত লেখ্য ভাষা। ১৯৬১

ব্যঙ্গ-কৌতুকের সপক্ষে

মানুষের চেয়ে বিচিত্র জীব আর নেই। অবস্থা আর মন তাকে আরো বিচিত্র করে তোলে। কথা আর ব্যবহারে ঘটে তার প্রকাশ। অনেক সময় তা হয় পরস্পর-বিরোধী। বুদ্ধি আর বোকামির এমন অপূর্ব সমন্বয় মানুষে ছাড়া অন্যত্র দুর্লভ। কেউ কেউ আদতেই বোকা, কেউ কেউ আবার ইচ্ছা করেই বোকা সাজে আর তখন সেটা হয় চাতুর্যেরই রকমফের। অর্থাৎ চাতুর্যের সাথে বোকা বনে এমন মানুষ হাসিল করে নেয় কোন একটা উদ্দেশ্য। এভাবে বোকামি হয় উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ার। অনেক সময় বুদ্ধি হয় তার সহায়ক। এ বুদ্ধির চালাকিটুকুর অভাব ঘটলে মানুষ হয়ে পড়ে নেহাৎ সরল, আর এখন এ ধরনের সরল মানুষকেই মনে করা হয় বোকা। বুদ্ধি আর বুদ্ধিমানেরও সংজ্ঞা এক নয়—সৎবুদ্ধি, কু-বুদ্ধি, দুষ্ট-বুদ্ধি ইত্যাদি ত আছেই। আবার স্রেফ চালাকিকেও লোকে বুদ্ধি বলে ঠাউরায়। সৎবুদ্ধি বিশেষ করে এযুগে তেমন কাজে লাগে না। এখন বরং চালাকিরই যুগ—তাই চালাকির পথেই এখন আসে সাফল্য। চালাক ছেলের কদর এখন সমাজে সব চেয়ে বেশী।

লেখক আর শিল্পীরা সচেতন মানুষ—বাইরের চোখের মতো তাদের মনের চোখও সব সময় খোলা থাকে। শুধু চোখ নয়—পাঁচটা ইন্দ্রিয়ই তাদের সব সময় খোলা রাখতে হয়। চারদিকের মানুষ আর সমাজকে এ পঞ্চইন্দ্রিয় দিয়েই তাদের হয় দেখতে। অবস্থার হেরফেরে বুদ্ধিমান কি করে বোকা বনে, আর বোকা কি করে বুদ্ধিমান হয় এ সবই তারা দেখে। মানুষ যে কত সময় কত বিচিত্র আচরণ করে বসে তার কোন শেষ নেই। যা বলে, হয়তো করে তার বিপরীত। বিশ্বাস আর অবিশ্বাস, ভালো আর মন্দ, পাপ আর পুণ্য, সত্য আর মিথ্যা, এসব মানুষের মধ্যে

একাকার হয়ে মিশে গেছে, মিশে রয়েছে। লেখকরা তা দেখতে পায়, বুঝতে পারে কোথায় রয়েছে স্ববিরোধিতা। ব্যক্তি-মানুষকে নিয়েই সমাজ। ব্যক্তি-চরিত্রের এসব ক্রটি-বিচ্যুতি, সরলতা-দুর্বলতা সব কিছুই সমাজ-জীবনে প্রতিফলিত। ভালো আর মন্দের টানাপোড়েন সব সময়ই বিরাজ করছে সমাজে। এ দু'দিককে লেখকরাই রূপ দিয়ে থাকে। ভালোর প্রশংসা আর মন্দের নিন্দা—তাদের একটা বড় লক্ষ্য তাতে সন্দেহ নেই। ভালোকে যেমন তেমনি নিন্দনীয়কেও চিত্রিত করার বহু পদ্ধতি রয়েছে। এর জন্য সাহিত্যে একটি স্বীকৃত পদ্ধতি হচ্ছে ব্যঙ্গকৌতুক। হাস্যকরকে হাসির খোরাক করে তোলা—ভাষায়, বর্ণনায় আর চরিত্র-চিত্রণে। এ ধরনের রচনা পড়ে মানুষ হাসে, এমনকি যে নিজে হাসির পাত্র সেও না হেসে পারে না। ঈর্ষা হাস্য-কৌতুকের পরম শত্রু—রচনায় ঈর্ষার অনুপ্রবেশ ঘটলে ব্যঙ্গ-রচনার প্রধান উদ্দেশ্যই হয়ে যায় ব্যর্থ। হাসি মানুষের মন থেকে সবরকম ক্লেদ-গ্লানি দূর করে দিয়ে মনকে করে তোলে হালকা আর নির্মল। সাহিত্যের এক কাজ মনের স্বাস্থ্য-রক্ষায় সহায়তা করা। হাসির গল্প তথা ব্যঙ্গ-কৌতুকের দ্বারাই তা সম্ভব হয় সহজে। তাই সব সাহিত্যের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ব্যঙ্গ-কৌতুক। আর এমন কোন বড় লেখক নেই, যিনি কিছু-না-কিছু ব্যঙ্গ রচনা লিখেননি। আমাদের এ যুগের রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল ইসলাম এঁরা সকলেই ব্যঙ্গ রচনায় হাত দিয়েছেন। সমাজে কোন কালেই হাসির পাত্র কিম্বা হাসির খোরাকের অভাব পড়েনি—মানুষ নামক বিচিত্র জীব যতদিন বেঁচে আছে, যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন হাসির উপাদানের কোন অভাব পড়বে না। তবে সে সবকে দেখার চোখ থাকা চাই, ক্ষমতা থাকা চাই ভাষায় রূপ দেয়ার।

আমাদের সাহিত্যের এদিকটা এখনো দরিদ্র, শোচনীয়ভাবে দরিদ্র। জীবনের এদিকটার দিকেও আমাদের শক্তিশালী লেখকদের মন আর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। সাহিত্যের বহুদিকের এও একটা দিক, এদিকটা অপূর্ণ থাকলে গোটা সাহিত্যই অপূর্ণ থেকে যাবে।

বলাবাহুল্য, একমাত্র মানুষই জানে আর পারে হাসতে। তবে আশ্চর্য, এ মানুষই আবার হয় হাস্যকর ও হাসির পাত্র। লেখকদের দায়িত্ব, জীবনের এ হাস্যকর দিকটাকে উদ্‌ঘাটিত করে সমাজ-দেহে হাসির স্বাস্থ্যকর রৌদ্র ছড়িয়ে দেয়া। ১৯৬৯

সংস্কৃতি

ইংরেজী Culture শব্দের বাংলা তরজমা করা হয়েছে 'সংস্কৃতি'। কাল্‌চার শব্দের ধাতুগত অর্থ কর্ষণা অর্থাৎ সোজা কথায় চাষ করা। জমি রীতিমতো কর্ষিত না হলে যত ভালো বীজই বপন করা হোক না কেন তাতে ভালো ফসল কিছুতেই আশা করা যায় না। মন জিনিসটাও প্রায় জমির মতই। মনের ফসল পেতে হলে তারও রীতিমতো কর্ষণের প্রয়োজন। নজরুল প্রায় বালকবয়সেই তাই লিখেছিলেন :

চাষ কর দেহ জমিতে।
হবে নানা ফসল এতে ।।
নামাজে জমি 'উগালে'
রোজাতে জমি 'ফসালে'
কলেমায় জমিতে মই দিলে
চিন্তা কি হে এ ভবেতে ।।

অর্থাৎ ধার্মিক হতে চাইলেও ধর্মীয় বিশ্বাস আর অনুষ্ঠানের দ্বারা মনের জমিতে ভালো করে চাষ দেওয়া চাই। তা হলেই ধর্মের যা ফসল তা পাওয়া যাবে পুরোপুরি। মনের চর্চা ছাড়া ধর্ম-জীবনেও মানুষ সফল হতে পারে না। বলা বাহুল্য, ধর্ম-কর্মও একরকম সংস্কৃতি চর্চা। এতেও মন আর চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হয়। তবে এর জন্য চাই আন্তরিকতা আর চাই সত্যিকার ধর্মভাব আর ধর্মচেতনাকে নিজের মনের অঙ্গ করে নেয়া।

প্রচলিত অর্থে যাকে আমরা সংস্কৃতি বলি তারও লক্ষ্য মন আর চরিত্রের উৎকর্ষসাধন। সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, চিত্রকলা, নৃত্য কিংবা নাট্যাভিনয় এসবেরও ঐ একই লক্ষ্য—এসব মনচর্চা বা মনের কর্ষণারই

হাতিয়ার। মনের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে এসব স্রেফ এক মামুলি যান্ত্রিক ব্যাপার হয়ে পড়ে। তাতে লোকভুলানো রেওয়াজ পালন করা হয় সত্য, কিন্তু সংস্কৃতিচর্চার যা উদ্দেশ্য তা ব্যর্থ হয়ে যায়। আমাদের দেশে এখন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অন্ত নেই, কিন্তু সত্যিকার সাংস্কৃতিক জীবন কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। সাংস্কৃতিক জীবন মানে সুন্দর ও শোভন জীবন—যার মন-মানসের পুরোপুরি বিকাশ ঘটেছে একমাত্র সেই হতে পারে এমন জীবনের অধিকারী।

সব মানুষই অন্তরের নানা শক্তি নিয়ে জন্মায়। কিন্তু সেগুলো সুপ্ত আর অবিকশিত থাকে। নানাবিধ চর্চা আর অনুশীলন দ্বারা সে সবকে জাগিয়ে আর বিকশিত করে তুলতে হয়। এ কাজের শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম হচ্ছে সাহিত্য আর নানা শিল্পকলা। এসবকে অন্তরে গ্রহণ করে নিজের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ করে নিতে পারলেই এ বিকাশ হয় সহজ। অন্তরের সঙ্গে সম্পর্কহীন পোশাকী সংস্কৃতিচর্চার কোন মানে হয় না—আশা করি তোমরা এ বিষয়ে সাবধান থাকবে। তোমাদের সাধনা হোক মনের দিক দিয়ে সংস্কৃতিবান হয়ে ওঠা, নিজেদের মন আর চরিত্রের উৎকর্ষসাধন করে পুরোপুরি মানুষ হওয়া। সংস্কৃতিচর্চা তখনই মানুষের জীবনে সার্থক হয়ে ওঠে। ১৯৬৭

যে লোকসংগীত চলমান জীবনের অংশ

সাহিত্য জীবন বিচ্ছিন্ন নয়—এ কথা আমরা বলছি, হর-হামেশা শুনছিও। কিন্তু আধুনিক নামে চিহ্নিত সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যাবে এর অনেকখানিরই উৎসমূল ভিন্‌দেশী। তার উপকরণ আহৃত নয় আমাদের চলমান জীবন থেকে। আধুনিক সাহিত্য আশানুরূপ জনপ্রিয় না হওয়ার অন্যতম কারণ বোধ করি এটি। এ সাহিত্য পরিশীলিত আর পরিমার্জিত যেমন তেমনি তা সর্বদেহে বহন করে অধীত বিদ্যার স্বাক্ষরও—যে বিদ্যার জন্মভূমি সাতসমুদ্র তের নদীর ওপার। অশিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত রস-পিপাসুদের কাছে এ কারণে এ সাহিত্য তেমন আদৃত হচ্ছে না। সাহিত্য রসের ব্যাপার—সহজ সরল আর পরিচিত চিত্রকল্পের সাহায্যে রস পরিবেশিত হলে তা জন-চিত্তজয়ী না হয়ে পারে না। লোক-সাহিত্যের বড় গুণ এখানে যে তা ভাষা, আঙ্গিক আর বিষয়-বস্তুতে সহজ সরল—তার উপমা এবং চিত্রকল্প পাঠক বা শ্রোতার পরিচিত জগৎ থেকেই নেওয়া। জীবনের আনন্দ-বেদনা যা সাহিত্য ও শিল্পের চিরন্তন বিষয়বস্তু তার প্রকাশও জন-গণমন বোধ্য আর গ্রাহ্য হওয়া চাই। বলা বাহুল্য, এ প্রকাশ কখনো রুদ্ধ হয়ে থাকেনি। রাজ-সভায় কিম্বা শহরে-বন্দরে-নগরে যেমন তার প্রকাশ ঘটেছে অবিরত তেমনি দূর অজপাড়াগাঁয়েও তার প্রকাশ লৌকিক ভাষা ও আঙ্গিকে অনিরুদ্ধই রয়েছে চিরকাল। এ প্রকাশের সঙ্গে মানুষের জীবন-সত্তার এমন এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক যে, কোন অবস্থাতেই তা মৌন হয়ে থাকেনি। দুঃখ-সঙ্কট বিপর্যয়ে তা যেন আরও হয়ে উঠেছে মুখর। শিক্ষা-দীক্ষা কিংবা বিদ্যা-বুদ্ধির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেনি তা কখনো। যেখানে মানুষ সেখানেই প্রকাশ—এ প্রায় সব যুগে সব দেশেই দেখা গেছে। স্বভাবতঃই এ প্রকাশ দু'টি খাতে প্রবাহিত—

যার নাম দেওয়া যায় শিক্ষিত আর অশিক্ষিত। অশিক্ষিত মানে একেবারে বর্ণ-জ্ঞানহীন এমন ধরে নেওয়ার কোন কারণ নেই। যদিও অশিক্ষিত রচয়িতাদের মধ্যে বর্ণ-জ্ঞান-হীনেরও অভাব নেই। রচনা মানে শুধু কাগজে-কলমে লেখা নয়—প্রাচীনকালে অধিকাংশ রচনা মুখে মুখেই হোত। এখনো গ্রাম দেশে এ নিয়ম সমানে অব্যাহত।

লোকসংগীত রচয়িতারা অধিকাংশই গ্রামের লোক, অনেকেই নিরক্ষর আর মুখে মুখেই তারা করেছে রচনা। কাগজ-কলমের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক খুবই কম। এদের রচনা ওদের আর ওদের চার পাশের চলমান জীবনের সাথী, তাই তাতে দেখা যায় সে জীবনেরই আনন্দ-বেদনার অভিব্যক্তি। প্রতিদিন যে সুখ-দুঃখ ও বিরহ-মিলনকে ওরা দেখেছে তাকেই ওরা বিষয়বস্তু করে নিয়েছে নিজেদের রচনার। ঈশ্বর গুপ্তকে বলা হয় প্রাচীন ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণের কবি। লোকসাহিত্যের বড় বৈশিষ্ট্য তা লৌকিক, প্রাকৃত, সম্পূর্ণভাবে দেশজ। এ ভংগী ঈশ্বর গুপ্তে লক্ষ্যগোচর। তাঁর কাব্য থেকে স্থূল আহার্যও বাদ যায়নি। নিরক্ষর খাঁটি লোক-কবিদের রচনায়ও তার অভাব দেখা যায় না। ঈশ্বর গুপ্ত 'তপ্সে মাছ' কিম্বা 'পাঁঠা' সম্বন্ধেও মুখরোচক কবিতা লিখেছেন। চট্টগ্রামে এক নিরক্ষর লোক-কবি 'ইলিশ মাছ' সম্বন্ধে লিখেছেন এক অনবদ্য গান। যা এক সময় এত জনপ্রিয় ছিল যে, মেয়েরাও কাজের ফাঁকে ফাঁকে গুন গুন করে তা গাইত। এর রচয়িতা অজ্ঞাত। গানটি উধৃত হলো নিচে :

গরবা বুঝাইন্যা মাছ
মেলা ডুবাইন্যা মাছ
রাঁধুনী চতুর লে মাছ ইলিশা রে—
ছিঁড়া জালে গাফ দিয়া বসাইলাম খালে
সকল মাছগিন্ ধাইয়া গেল একটি রইল জালে
রে মাছ ইলিশারে ॥
ইলিশারে কুইটে গেল দাওত নাইদে ধার
হাতের ভাঙ্গিল সোনার বালা গলার ভাঙ্গিল হার
রে মাছ ইলিশারে ॥
কুডিকাডি ইলিশারে ধুইবার লাগি আসে
আধাগিন উড়াইয়া নিল পোবনের বাতাসে
রে মাছ ইলিশারে ॥
ইলিশারে রাঁধিবার লাই তৈলেনত দিল তেল

রাঁধুনীর ছটফড়ি দেখি তেলৈন ফাড়ি গেল
রে মাছ ইলিশারে ॥
রাইনতে বাইরতে ইলিশারে মনে কয়দে খাই
ঘরে আছে কাল ননদী কথারে ডরাই
রে মাছ ইলিশারে ॥
গরবা মানে অতিথি বা মেহমান।

এ গানে শুধু ইলিশ মাছের কথা যে বলা হয়েছে তা নয়, যে গৃহস্থ বধূটি মাছটাকে রান্না করছে তার মনের চেহারাটিও হয়েছে এখানে প্রতিফলিত। তার আনন্দ-বেদনারও একটা পরিচয় আমরা পাচ্ছি এখানে। ইলিশ বাংলাদেশের সব চেয়ে মুখরোচক আর সব চেয়ে জনপ্রিয় মাছ।

এ মাছের সরস উল্লেখ আধুনিক সাহিত্যেও একেবারে অনুপস্থিত নয়। দেশ বিদেশের নানা খাদ্য খেয়েও সৈয়দ মুজতবা আলী ইলিশ মাছের স্বাদ ভুলতে পারেননি। তার মতে খাদ্যের সেরা খাদ্য হচ্ছে ইলিশ মাছ আর সরু চালের ভাত। অধীত বিদ্যায় অন্যতম সেরা কবি বুদ্ধদেব বসু ত এক আস্ত সনেটই লিখে ফেলেছেন ইলিশ মাছ সম্বন্ধে—যে সনেট তাঁর অন্যতম সফল কবিকর্ম। আমার বিশ্বাস পূর্ব বাংলায় যাদের জন্ম তারা যেখানেই থাকুক ইলিশের রসনা-লোভন স্মৃতি তাদের বারে বারেই হানা দিয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের গ্রাম্য কবি ইলিশকে নিয়ে যে রস সৃষ্টি করেছে তা আজো অনতিক্রম্য।

স্বাধীনতার আগে এদেশের বহু লোক জীবিকা অন্বেষণে বার্মা যেত—বার্মা নারী স্বাধীনতার দেশ। অনেকে বার্মা-রমণীর রূপজ মোহে মুগ্ধ হয়ে সেখানেই থেকে যেতো সারাজীবন। বিশেষ করে তরুণবয়স্করা। তখন বার্মা নামটা তেমন পরিচিত ছিল না—পরিচিত ছিল রেঙ্গুন। তখন লোকে বলতো রেঙ্গুন যাচ্ছি কিম্বা রেঙ্গুন থেকে এলাম। রেঙ্গুনের রঙ্গিলা মেয়েদের পাল্লায় পড়ে বা ওদেরে নিজেদের পাল্লায় ফেলে. এদেশের বহু পুরুষ তখন রেঙ্গুন তথা বার্মাবাসী হয়ে পড়তো। অনেকে ভুলে যেতো মা-বাপ, ভাই-বোন আর নিজের স্ত্রী-পুত্রের কথা। এর ফলে বহু পরিবারে নেমে আসতো বিয়োগান্ত পরিণতি। এ অবস্থাও গ্রাম্য কবির মনে কাব্য তথা সঙ্গীতের প্রেরণা যুগিয়েছে। বলা বাহুল্য, সব লোককাব্যই সঙ্গীতধর্মী। গাওয়াই ছিল তার চরম লক্ষ্য। লোকের মুখে মুখেই ফিরতো এসব সঙ্গীত। 'রেঙ্গুন-রঙ্গিলা' চট্টগ্রামের একটি

প্রসিদ্ধ লোকসঙ্গীত। আজ রেঙ্গুনের সঙ্গে এদেশের সাধারণ মানুষের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, কিন্তু হৃদয়ের আনন্দ-বেদনা যে সঙ্গীতে রূপ পেয়েছে তাতো কালজয়ী। তাই আজো চট্টগ্রামের দূরাঞ্চলেও এ গান শোনা যায় :

রেঙ্গুন রঙ্গিলার মনে মজি গেল মন
এমতে দেওয়ানা হইয়া গেল কতজন
মায়ে বলে ওরে পুত রেঙ্গুন না যাইও তুই
হাজার টাকা রোজগারে [illegible]
রেঙ্গুন [illegible]— — —।
না লইল ভাতের মোচা
না লইল কড়ি
[illegible]
[illegible]
রেঙ্গুন — —।
সদরঘাটে [illegible]
হুড় করি কাঁদি উঠে মায়া।
[illegible] বুড়া
রেঙ্গুন — —।
[illegible]
হঠাৎ মনে পড়ে গো।
আমার মা-বাপ কই
রেঙ্গুন — — —।
ছোট ভাই কাঁদে উঠে
বন্ধা [illegible] গো।
ইষ্টিমারে উঠি বন্ধা রেঙ্গুন চলি গেল।
রেঙ্গুন — —।
রেঙ্গুনেতে যাই বন্ধে
ভাত কিনি খাইল
ছোট ভাই বোনের কথা
মনেতে উঠিল।
রেঙ্গুন— — —।
গায়ে কোট আর চিকন ধুতি

শিঁখিতে লাগি—
চোখে চশমা হাতে ঘড়ি বেড়াইতে লাগি
রেঙ্গুন--- ।
কলিকাতা বোম্বাই সরে বেড়াইয়া আসিল
রেঙ্গুনের সমান সাদা কখনো না হইল
রেঙ্গুন--।।

দেবানা—দিওয়ানা, পাগল। বিবা—বিবাহ। মোচা—কলা কিম্বা পদ্ম পাতায় তরকারি পথের পাথেয় হিসাবে বেঁধে নেওয়া। বদ্দা—বড় ভাই, বড় দাদা। সরে—শহরে। নীচে উদ্ধৃত সঙ্গীতটি রচিত হয়েছে ১৩৪৩ সালের নির্বাচনের সময়। তাই এটি অধিকতর হালের রচনা। রচয়িতার নাম মুহম্মদ ইসমাইল। তখন এক নির্বাচনী প্রতীক ছিল যথাক্রমে লাঙ্গল, খেজুর গাছ আর ছাতা। কবি লাঙ্গলের সমর্থক। তাঁর কবিকন্ঠ তাই লাঙ্গলের প্রশংসা সোচ্চার হয়ে উঠেছে এভাবে :

আমার লাঙ্গল ভাই,
আমার লাঙ্গল ভাই, নাহি চাই
আর কিছু ধন
লাঙ্গল মোদের পরম বন্ধু
জীবনের জীবন।
শুনেন তার পরে
শুনেন তার পরে, খেয়াল করে
খাজুর গাছের কথা
বছরে পাই দুইমাস রস
কাটি তার মাথা
এইত গুণ তার
এইত গুণ তার, বলি আর
ভাই সকলেরে
ছয়মাস ঘরে বসে থাকে,
কাঁটা যদি ফোঁড়ে।
শুনেন ছাতীর কথা
শুনেন ছাতীর কথা, বাঁচে মাথা
অল্প বৃষ্টি হইলে
কাপড় চোপড় ভিজে যায়
ঝড়-তুফানে পাইলে

মোদের জোংরা সম্বল

মোদের জোংরা সম্বল, ভাই সকল
খেয়াল করি চান
লাঙ্গল, জুয়াল, জোংরা মোদের
বাঁচাইবে পরান
এখন বিদায় চাই এখন বিদায় চাই, শুনেন ভাই,
মোমেন মোছলমান
লাঙ্গলেরে ভোট দিলে বাঁচিবে পরান
লাঙ্গল চাষার পক্ষে
লাঙ্গল চাষার পক্ষে, চাষার পক্ষে
জানিবেন সকলে
আদমির নামে কাজ নাই
ভোট দিবেন লাঙ্গলেরে।
শেষ নিবেদন
শেষ নিবেদন, মোমেনগণ
করি সবার ঠাঁই
ভোট দিবেন বাক্সের পরে
লাঙ্গল মার্কা চাই।
আচ্ছালামু আলায়কুম ।।

লোক-কবিরা যেমন জন-জীবনের অংশ ছিলেন তেমনি তাঁদের রচিত সঙ্গীতও ছিল জন-জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাঁরা কেতাবী বিদ্যা কিম্বা মহৎ ভাব আর মহৎ চিন্তা নিয়ে তেমন মাথা ঘামায়নি। ঘামাতে গেলে তাঁদের রচনা হয়ে পড়তো অনেকখানি কৃত্রিম ও ফাঁকা। লোক-কবিরা চারপাশের চলমান জীবনেরই শিল্পী। চট্টগ্রামের যে তিনটি লোকসঙ্গীত এখানে উদ্ধৃত হলো তাতে নিঃসন্দেহে সে-জীবনেরই প্রতিফলন ঘটেছে। এসবের ভাষা, আঙ্গিক আর সুর এত সহজ ও সরল যে, তা আপামর জনগণের জীবনের অঙ্গ হতে কোন বাধা হয়নি। এক সময় প্রথম দু'টি গান অন্তরালবাসিনীদের মুখে মুখেও শোনা যেতো। এসব লোক-সঙ্গীত প্রমাণ করে রসের কোন সদর-অন্দর নেই। রস সার্বজনীন। পূর্ব বাংলার লোকসাহিত্য এ সার্বজনীনতায় সমৃদ্ধ। ১৯৭।

এক অনন্য মানুষ ও তার কবিতা

এক

দীর্ঘ পাঁচ বছর পক্ষাঘাতে ভুগে সম্পূর্ণ পঙ্গু অবস্থায় এ অনন্য মানুষটি গত ২৭শে আগষ্ট লোকান্তরিত হয়েছেন। তাঁর দেহটি ছিল বিশাল। দেখবার মতই। রাজনীতি করেছেন কিন্তু সার্থক রাজনীতি করবার জন্য যেটুকু উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন তাও তাঁর ছিল না। লোকমান খাঁ শেরওয়ানীর উচ্চ শিক্ষা না পাওয়ার বা তেমনভাবে শিক্ষিত হতে না পারার বড় কারণ, শরীর চর্চার বাতিক আর সে যুগের ইংরেজ-বিরোধী রাজনীতির নেশা। ফলে জীবনে যেমন তেমনি রাজনীতিতেও বেশী দূর অগ্রসর হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। রাজনীতিরও একটা বৃহত্তর দর্শন আছে—সে তো আর শুধু আন্দোলন আর উত্তেজনা সৃষ্টি বা দীর্ঘকাল জেল খাটায় সীমিত নয়। জনগণের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত সে বৃহত্তর দর্শন আর দূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি আর রূপায়ণের জন্য চাই যথাযোগ্য শিক্ষা আর মননশীলতা। লোকমানের সে-সবের অভাব ছিল। তাই রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি তেমন কোন ছাপ রেখে যেতে পারেননি। মওলানা মনীরুজ্জমান ইসলামাবাদীর ভক্ত আর অনুসারীদের অন্যতম ছিলেন আলী আহমদ ওলী ইসলামাবাদী—লোকমানের মতো শেষোক্তজনও চট্টগ্রামের পাঠানটুলি মহল্লার অধিবাসী ছিলেন। লোকমান আলী আহমদ ওলীর বিশেষ অনুরক্ত আর ছিলেন খুবই প্রিয়পাত্র। সিনিয়র আর জুনিয়র দুই ইসলামাবাদীই রাজনীতি করতেন—রাজনীতি ছিল ওঁদের সারা জীবনের ব্যসন। স্বভাব প্রবণতায় নয়, আলী আহমদ ওলীর প্রভাবেই লোকমান প্রায় কিশোর বয়সেই রাজনীতিতে ভিড়ে পড়েন। পরে অবশ্য কংগ্রেসের

সব বড় বড় নেতার সংস্পর্শে তিনি আসেন। অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও তাঁর ঘটে। সে সুবাদে একাধিকবার জেলও খেটেছেন তিনি।

তবুও সত্যিকার অর্থে রাজনীতিবিদ ছিলেন না লোকমান শেরওয়ানী। সেদিনও তাঁর প্রধান মূলধন ছিল তাঁর সুঠাম অনন্য দেহ অবয়ব। হাজার জনতার মাঝেও তিনি থাকতেন শীর্ষ-মস্তক—দেখা যেতো সকলের উপরে। খদ্দর দিয়ে তৈরী হলেও যে কোন পোশাকেই তাঁকে মানাতো। একবার এক বন্ধু হজ্ব করে ফেরার সময় তাঁর জন্য এক প্রস্থ আরবী পোশাক এনেছিলেন। সেটা পরে সারা শহর টহল দিয়ে, সব আত্মীয় বাড়ী ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে বেড়াতেন মাঝে মাঝে। মনোভাবটা ছিল : এই দেখ, এ পোশাকেও আমাকে কেমন মানিয়েছে। সত্যই দেহটা তাঁর দেখার মতই ছিল আর দেখিয়েও তিনি পেতেন অসীম আনন্দ। দুই তিনটা বড় সাইজের লুঙ্গি সেলাই করে নিলেই তাঁর একটা লুঙ্গি হতো। সে রকম সব কিছু। শুনেছি দমদম জেলে তাঁর জন্য আলাদা খাট বানাতে হয়েছিল কর্তৃপক্ষকে। জেলেও যেটা চাইতেন সেটা না পেলে শিশুর মতো নাকি তোলপাড় শুরু করে দিতেন। শুটকি চাইতে শুটকিই সরবরাহ করতে হবে সেই দমদম জেলের ভেতর। বৃটিশ আমলে রাজবন্দীদের প্রতি ব্যবহার অনেক বেশী মানবিক আর ভদ্র ছিল। লোকমানের বিধবা মাকে একশ' কি একশ' দশ টাকার মতো ভাতাও দেওয়া হতো তখন। প্রতি ছ'মাস অন্তর এসব কয়েদীদের দেওয়া হতো নতুন জামা কাপড়, তার থেকে ফালতু আর ওঁর ব্যবহৃত কাপড় চোপড় যা লোকমান বাড়ী পাঠিয়ে দিতেন তা দিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের পর্যন্ত সম্বৎসরের জামা কাপড় নাকি হয়ে যেতো।

স্বাধীনতার পর অবস্থার হেরফেরে পড়ে তাঁর মধ্যে কিছু বিভ্রান্তিও যে দেখা দেয়নি তা নয়। সকলেরই জানা কথা 'সোসাইটি ফর কালচারেল্ ফ্রিডম' আমেরিকার গোয়েন্দা বিভাগ পরিচালিত এক প্রতিক্রিয়াশীল সংস্থা। খুব স্বল্পকালের জন্য হলেও লোকমান এদের খপ্পরেও একবার পড়েছিলেন। এদের 'ইস্তাহার আর তথাকথিত সাহিত্য' ইত্যাদি নিয়ে তিনি আমাদের সঙ্গেও এক আধবার দেখা সাক্ষাৎ করেছিলেন মনে পড়ে। অন্যান্য কংগ্রেসসেবীদের মতো তখন তাঁর জীবনেও নেমে এসেছিল 'মন্দা'— ভুগছিলেন দারুণ অর্থসংকটে। একবার ঐ সংস্থার এক চাঁই এসেছিলেন চাটগাঁ, তাঁর ওখানে একটা টি-পার্টিরও ব্যবস্থা হয়েছিল ঐ চাঁইটির সম্মানার্থে। আত্মীয় হিসেবে আমরাও আমন্ত্রিত হয়েছিলাম আর না যেয়ে পারিনি। মনে

পড়ে ফেরার পথে জনাব মাহবুব-উল আলম তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, আজ আমাদের পেটেও কিছু ডলার পড়লো।

উত্তরে বলেছিলাম : বেরিয়ে যাওয়ার জন্য কাল সকাল পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা না করে উপায় নেই।

লোকমানের সব চেয়ে প্রশংসনীয় দিক ছিল তাঁর দিল। অমন কোমল, মুক্ত আর দরাজ দিল খুব কম দেখা যায়। কোন রকম ক্ষুদ্রতা, নীচতা, সংকীর্ণতা আর যাকে বলে 'মুষ্টিবদ্ধতা' তাঁর জীবনে কখনো দেখা যায়নি। সম্বল না থাকলেও অপরের সাহায্যে তিনি এগিয়ে যেতেন সব সময়। বিশেষ করে গরীব আত্মীয় আর পাড়া-প্রতিবেশীদের অভাব-মোচনে এগিয়ে যাওয়া তাঁর এক সহজাত অভ্যাস ছিল। এমন কি নিজের ব্যবহারের বস্তুও অনেক সময় বিলিয়ে দিতে দেখেছি তাঁকে। কেউ চাইলে না করতে পারতেন না তিনি।

কেউ যদি বলতো : আপনার কলমটা ত দেখতে ভারী সুন্দর।

: আচ্ছা, এটা তুমিই নিয়ে যাও। বলে কলমটা ওর হাতে তুলে দিতেন। কেউ হয়তো ঠাট্টা করেই বল্লো : আপনার চাদরটাত ভারী চমৎকার।

: ঠিক আছে। এটা তুমিই গায়ে দাও গে। আমি আর একটা যোগাড় করে নেবো। জীবনে এই ছিল লোকমান খাঁ শেরওয়ানী। যে ভাবেই হোক হাতে টাকা এলে ত উড়িয়ে না দিয়ে তিনি যেন নিশ্চিন্ত হতে পারতেন না। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে জুটে এটা ওটা করতে চেয়েছেন বহুবার। লাভের মধ্যে শেষ কালে দেখা গেল তাঁর শাশুড়ীর দেওয়া তেরটি হাজার টাকা শূন্যে বিলীন। বিস্কুট তৈরী, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বানানো, হাকিমী দাওয়াইখানা খোলা ইত্যাকার আরো বহু কিছু করতে চেয়েছেন জীবনে বন্ধুদের সঙ্গে মিলে। বন্ধুরা কেউ বিস্কুট ফ্যাক্টরির মালিক, কেউ হোমিও ডাক্তার, কেউবা য়ুনানী হাকিম হয়ে গেছেন। লোকমান যেখানে ছিলেন সেখানেই রয়ে গেলেন—চির বেকার আর কপর্দকহীন। মৃত্যুও বরণ করেছেন সে অবস্থায়। আত্মীয়, পরিচিত আর সহকর্মীদের মধ্যে এমন লোক বোধ হয় খুব কমই আছে যে জীবনে কোন না কোন উপকার বা সাহায্য পায়নি লোকমানের কাছ থেকে। আর সেই লোকমান কিনা মারা গেল অত্যন্ত অসহায় আর নিঃসম্বল অবস্থায়। এভাবে সেদিন তার বিশাল দেহের সঙ্গে বিশাল প্রাণটিও হারিয়ে গেল হতাশার এক নিঃসীম অন্ধকারে। এ

মহাপ্রাণ মানুষটির অন্তিম মুহূর্তে সম্পূর্ণ ভিন্ন জগৎ থেকে আগতা একটি মেয়েই শুধু তাঁর শিয়রের কাছে বসে অন্তরের সেই দীপ-শিখাটিই জ্বালিয়ে রেখেছিল যা যৌবন প্রভাতে সে বুকে করে বয়ে এনেছিল দুই চোখের অশ্রু-চলও যা পারেনি নিভাতে। পাঁচ বছরের পঙ্গু-জীবনে, যথাযথ চিকিৎসা ও পথ্যের অভাবে লোকমানের প্রধান মূলধন দেহটিও জীর্ণ-শীর্ণ এক কংকালসারে পরিণত হয়েছিল। সেদিনে ২৮শে আগষ্ট (১৯৬৯) যাঁকে চিরতরে মাটির নীচে শুইয়ে দেওয়া হলো তিনি আমাদের পরিচিত শেরওয়ানী নন। সেই শেরওয়ানীরই এক ছায়ামূর্তি।

দুই

আশ্চর্য, লোকমান খাঁ শেরওয়ানী কবিতাও লিখতেন। অসহযোগ-খেলাফতের উত্তাল দিনে জাতীয় উদ্দীপনা-মূলক তাঁর চটি এক কবিতার বইও যেন আলী আহমদ ওলীর উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল। তার কোন কপি আর এখন খুঁজে পাওয়া যায় না। নিজের বাইরের রূপ আর অবয়বের মতো নিজের মনকেও লোকমান প্রকাশ করতে চেয়েছেন সব সময়। কবিতা ছাড়া প্রবন্ধও লিখেছেন অনেক। সবই সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে। আমার বিশ্বাস শবনমের নামে যত লেখা বেরিয়েছে তাও লোকমানেরই রচনা। শেষ জীবনে হঠাৎ এক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে পঙ্গু হয়ে না পড়লে হয়তো রচনাগুলি সংগ্রহ করে বই আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা তিনি করতে পারতেন। বিত্তশালী বন্ধুর তাঁর অভাব ছিল না। কিন্তু মুখ খুলে চাইতে পারতেন না কারো কাছে ; তবুও রোগশয্যা থেকে নির্দেশ দিয়ে এক আত্মীয়ের সাহায্যে একটি কবিতার বই, যার নাম দিয়েছিলেন তিনি 'শবনম' (শিশিরের ফার্সী প্রতিশব্দ 'শবনম'-বলাবাহুল্য এ শব্দ, এ নাম লোকমানের অত্যন্ত প্রিয় ছিল), বের করার আয়োজন করেছিলেন। ছাপানো ফর্মাগুলিতে অজস্র ভুল আর অশোভন মুদ্রণ ইত্যাদি দেখে তিনি এত বিরক্ত আর হতাশ হয়ে পড়েছিলেন যে, ঐ অবস্থায় বইটি প্রকাশ করতে তাঁর মন কিছুতেই সায় দেয়নি। ফর্মাগুলি সেভাবেই পড়ে আছে আজো তাই ভাগ্য হলো না তাঁর মৃত্যুর আগে তাঁর প্রিয় নামের বইটার প্রকাশিত চেহারা দেখে যাওয়ার।

মুদ্রিত ফর্মাগুলির একটা কপি আমার দেখার সুযোগ হয়েছে। সেখান থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিলেই তাঁর কবিতার স্বরূপ তথা কাব্য-গুণ

বুঝতে পারা যাবে। তবে বুঝতে হবে স্বভাবে এবং বিশেষ প্রবণতায় তিনি কবি ছিলেন না—অনুশীলন বা চর্চার সুযোগও তেমন পাননি জীবনে। বিবিধ ১১

কর্মজীবনের ফাঁকে ফাঁকে আর কারাগারের অলস মুহূর্তেই যা কিছু তাঁর কাব্যচর্চা। বলা বাহুল্য আধুনিক কবিতার সঙ্গে শেরওয়ানীর কোন সংযোগ ছিল না। প্রধানত তিনি ছিলেন প্রাচীনপন্থী সমিল ছন্দের কবি। দু' একটা গদ্য ছন্দের কবিতাও যে লেখেননি তা নয়। তবে সংখ্যায় তা অতি নগণ্য। 'পঁচিশে বৈশাখ' নামে ষোল স্তবকের সুদীর্ঘ কবিতাটি তাঁর নিজেরও নাকি খুব প্রিয় ছিল। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে শান্তিনিকেতনে কবির এক জন্মদিবসের অনুষ্ঠানে পঠিত হয়েছিল বলে ভূমিকায় উল্লেখিত হয়েছে। কবিতাটির প্রথম স্তবকটিই শুধু এখানে উধৃত হলো :

উদয় অচলে জাগে তমোহর নাশিয়া তিমির ভয়,
অযুত কণ্ঠে জাগে কলরব আলোক তনয় জয়।
কে এল কে এল—বিশ্বভাবতে ধ্বনি ওঠে বার বার
আলোক-লোকের দূত এল ওরে—দূর হল আঁধিয়ার।
গগনে পবনে বনে উপবনে বাজে মঙ্গল শাঁখ
পঁচিশে বৈশাখ।

নজরুলের মতো কারাগারে বসে তিনিও অনেকগুলি কবিতা লিখেছেন। এ সংকলনে দেখলাম সেসব কবিতাই বেশী করে স্থান পেয়েছে। পরিচিত পরিবেশের বাইরে পাঁচিল ঘেরা কারাগারে হঠাৎ মোরগের ডাক শুনে তাঁর মনে যে ভাব জেগেছে তারই প্রকাশ ঘটেছে তাঁর 'মোরগ' নামক কবিতায়। সে কবিতার প্রথম কয়েক পংক্তি :

প্রতি প্রভাতের প্রণব-ছন্দ তব ভৈরব গানে।
জাগরণ আনে ঘুম-ভরা চোখে সুমধুর আহবানে।
নিতি যে মন্ত্র আনিছে সূর্য পূর্ব-গগন পুরে
আলোকের সেই বৈতালিকের অনুবাদ করা সুরে।
জেলের কবির জেলের দুয়ারে খর শব্দের হাতে,
চূর্ণিয়া দাও স্বপ্নের জাল প্রত্যহ শেষ রাতে।

'অনুনয়' কবিতাটিও জেলে বসেই লেখা। তার কয়েকটি চরণ :

বন্ধু, যেথায় বন্দীর পায়ে বন্ধন শৃংখলে
বাজে ক্রন্দন রোল.

১২। বিবিধ

ব্যংগ করিয়া সে ব্যথায় বাজে প্রেতের অট্টহাসি
ব্রতচারীর কাঁসী ঢোল।
সান্ত্রী বাজায় গারদের গায়ে নিত্য সন্ধ্যারতি
লোহার হাতুড়ি হানি,
নিপীড়িত নব আত্মার ব্যথা বাজায় আর্তসুরে
জেলের তেলের ঘানি।

সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে ছাত্রদের বিক্ষিপ্ত করে রাখার উদ্দেশ্যে ডাকসাইটে আই. সি. এস গুরুসদয় দত্তকে দিয়ে সরকার তখন ব্রতচারী নৃত্যের প্রচলন করতে চেয়েছিলেন স্কুলে স্কুলে, কবিতাটিতে তার প্রতি ইংগিত রয়েছে। লোকমানের কোন কোন কবিতায় নজরুলের প্রভাব সুস্পষ্ট। এও স্বাভাবিক, কারণ তখন যুগটাই ছিল নজরুল আর নজরুল কাব্যের।

জেলে বসে ঈদ সম্বন্ধে লেখা দু'টি কবিতার একটি এই :

আজি অমানিশা দূর দিগন্তে
খোলে ঘোমটা খানি,
বংকিম চাঁদে শংকিত তারা
হানে কটাক্ষ হানি।
দূর সাগরের কালো জলতলে
আলোকের কলি চন্দ্রমা জ্বলে—
আপনারে মেলে শত শত দলে
পূর্ণিমা হবে জানি।
লহ আজিকার বন্দী শালার
ঈদ্ মোবারক বাণী।

কোন কোন কবিতায় রূপ-কল্প চিত্রণেও এ কবি কিছুটা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।
যেমন :

কুঁচ বরণ কন্যার শিরে মেঘের বরণ চুল,
কান্নায় ঝরে পান্না আর হাসিতে মোতির ফুল।
রামধনুকের সাত বরণের জড়োয়া জড়ির চেলী,
অংগে লুটায়, হাতে মুঠায় নীলা কমল কলি।
(রূপকথা কলি)

'টপ্পা' নামক কবিতাটিতেও রূপ-তৃষ্ণার সে অভিব্যক্তি ঘটেছে যাতে বৈষ্ণব পদাবলীর লক্ষণ সুস্পষ্ট :

(তাই) এ দেহ নয়ন হতে চায়,
মিটে না নয়নে শুধ্ ও রূপ পিপাসা হায়।
অপলকে মেলে আঁখি
চাহে মন চেয়ে থাকি
অ-তনু নয়নে মাঝে অতনু মিলায়ে যায়।

শয়তান সম্বন্ধেও দুটি কবিতা এ সংকলনে স্থান পেয়েছে। দু'টি কবিতারই ভাব কিছুটা অভিনব। 'সুন্দর শয়তান' কবিতায় তিনি বলেছেন :

ভগবান নাকি রচেছে ভুবন ? মিথ্যা কথা,
যত পুঁজি লাগে রচিতে ভুবন পাবে সে কোথা ?
ন্যায়ের দাড়িটি হাতে লয়ে যে গো রয়েছে বসে',
শুধু খাতাটি খুলিয়া পাপ পুণ্যের হিসেব কসে
রূপের রসের লুকানো খবর সে কিবা জানে ?
সে তো শুধু বসে জাবদা খাতায় দাড়িই টানে।

অতএব এই জগতের সব রূপ রসের স্রষ্টা হচ্ছে শয়তান :

এই ভুবনের প্রজাপতি যে গো সে শয়তান
রসে টলমল এই শতদল তাহারি দান।

এ শয়তানই :

অভিসারিকার পথ বলে দেয় নিঝুম রাতে,
জোনাকি ধরিয়া প্রদীপ করিয়া চলে সাথে সাথে।
যমুনা পুলিনে সে বস্ত্র লুকিয়ে লাগিয়ে ধাঁধাঁ
লজ্জা শরমে গোপ বালাদের সে করে আঁধা।

* * * *

চিরকাল ধরে বিবাহ রাত্রে বরের বেশে
বধূর প্রথম শুভদৃষ্টিটি লুটেছে এসে।

কবিরা নাকি 'ওরই সন্তান' আর তারাই নাকি 'ধরার ছত্রপতি'—শয়তান তাদের হাতেই তার 'সোনার কাঠি' 'রূপোর কাঠি' তুলে দিয়েছে। তাই এ কবির শেষ ভক্তি এই শয়তানের প্রতিই নিবেদিত :

শয়তান ওগো কবি পিতা মোর তোমারি পায়—
মোর সকল ভক্তি সকল শ্রদ্ধা নিতি লুটায়।

'বিদ্রোহী শয়তান' কবিতায় তিনি শয়তানকে 'স্বৈরতন্ত্র', 'নিয়মতান্ত্রিকতার অচলায়তন' ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী রূপেই কল্পনা করেছেন। এ কবিতার সূচনা এভাবে :

পূতঃ বহ্নিতে তোমার জন্ম,
তাই কি—
খাণ্ডব দাহের জ্বালা তোমার বুকে,
লেলিহান বহ্নিশিখায়
তোমার অসন্তোষ ?

এ কবিতায়ও ভাব-কল্পনায় কিছুটা অভিনবত্ব আছে :

ইভের কানে শোনালে বিদ্রোহের বাণী
ভিত্ উঠলো কেঁপে
আকাশে আকাশে ধুলোবালির মেঘ,
ধূলিস্যাৎ হলো স্বর্গের অচলায়তন।
উলংগ ধরণীর বুকে
প্রকাশের বেদনা—
সৃষ্টির সৌজনা
নয়া সভ্যতার ইংগিত
সে তো তোমার দান।

শয়তানের প্ররোচনা আর কারসাজিতে মানুষ স্বর্গভ্রষ্ট না হলে দুনিয়ায় এ সভ্যতা গড়ে উঠতো কি করে ? কবি বোধ করি এই বলতে চান। এ কবিতার শেষ পংক্তি ক'টিও উধৃত হলো :

পুড়ে ছাই হয়ে যাক
নিয়মতন্ত্রের স্বর্ণ-পিঞ্জর।
সাম্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠুক—
সভ্যতার নয়া ইমারত।
ধ্বনিত হোক মানুষের কণ্ঠে—
আদি বিদ্রোহীর জয়নাদ।

'কয়েদী' নামক গদ্য কবিতায়ও এ ভাবই ধ্বনিত হয়েছে। সে কবিতার শেষ ক'টি চরণ :

উদয়াচলে সূর্যের আমন্ত্রণ,
স্বৈরতন্ত্রের চিতাভস্মে

নূতন যুগের অভিষেক।
মুক্ত মানুষের কণ্ঠে সাম্যের গান।

'বিবর্তন' নামক চার পংক্তির কবিতায় বিবর্তনের দ্বান্দ্বিক গতিশীলতার উপলব্ধি লক্ষ্য করার মতো :

জীবনের সাথে মরণের খেলা চলিয়াছে নিশিদিন
বিকাশের সাথে বিনাশের রণ চলিয়াছে কালে কালে।
সৃজনের সাথে ধ্বংসের লীলা পরিবর্তন হীন—
যুগ হতে যুগে কাল হতে কালে চলিয়াছে তালে তালে।

'জানিয়াছি আত্মায়' কবিতাটিও চার পংক্তিতেই শেষ। এ কবিতায় কবির গভীর এক আত্মবিশ্বাসের ছবিই যেন ফুটে উঠেছে। এটিই আমাদের শেষ উধৃতি—

আমি লভিয়াছি পরম সত্য জানিয়াছি আত্মায়
পাথেয় আমার ফুরাবে না কভু অন্তিম যাত্রায়।
আমি হেরিয়াছি অন্ধ তিমিরে আলোক লোকের পথ
প্রাণের দুয়ারে হেরিয়াছি আমি প্রাণ-বন্ধুর রথ।

লোকমান খাঁ শেরওয়ানীর এ কবিতা সংকলন বা অন্যান্য রচনা আদৌ প্রকাশিত হবে কি না জানি না। তাই ইচ্ছা করেই যে অসমাপ্ত সংকলনটি সাময়িকভাবে আমার হাতে এসেছে তার থেকে কিছুটা বেশী উধৃতি আমি না দিয়ে পারলাম না। পাঠক হয়তো এ থেকে এ গতায়ু মানুষটির বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুটা অন্তত ধারণা করতে সক্ষম হবেন।

১৯৭০

দু'টি উদ্বোধনী ভাষণ

শিশুরা জীবনের—ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতীক। তারা শুধু পিতা-মাতার বংশধারাকে বহন করে না, তারা যে সমাজে আর যে দেশে জন্মগ্রহণ করে তার ইতিহাস আর ঐতিহ্যকেও বহন করে। জাতির বহতা ধারাকে তারাই জারি রাখে—দেয় না শুকিয়ে কালের গর্ভে হারিয়ে যেতে। শিশুকে কেন্দ্র করেই মানুষ তার ভবিষ্যতের সাধ-স্বপ্নের ইমারত গড়ে তোলে। শিশুর জন্ম তাই সব দেশে সব সমাজেই আনন্দ আর উৎসাহের ব্যাপার। শিশুকে উপমা দেওয়া হয় ফুলের সঙ্গে, চাঁদের সঙ্গে। অর্থাৎ মানুষের চোখে যা কিছু সুন্দর শুচি-শুভ্র শিশু তারই দূত।

কিন্তু শিশু কখনো চিরকাল শিশু হয়ে থাকে না, থাকা সম্ভব নয়, থাকা উচিতও নয়। শিশুকেও একদিন মানুষ হতে হয়, যে ভবিষ্যতের সে প্রতীক সে ভবিষ্যৎ নির্মাণের দায়িত্ব তাকে নিতে হয়। ফুল বা চাঁদের সঙ্গে যতই উপমা দেওয়া হোক না কেন, শিশুকে কিন্তু চাঁদের মতো ডুবে গেলে কি ফুলের মতো ঝড়ে পড়লে চলে না; তাকে মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে হয়, গড়ে উঠতে হয় দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে। তাই শৈশব শুধু আনন্দের নয়, গড়ে উঠা প্রস্তুতি কালও। এ প্রস্তুতি দেহ আর মন দুই দিক দিয়েই—দেহের খোরাক যেমন তার জন্য অত্যাবশ্যক তেমনি মনের খোরাকও। এ দুয়ের যোগ্য বিকাশ ছাড়া কোন শিশুই প্রকৃত, সুস্থ আর জীবন-যুদ্ধের উপযোগী হয়ে মানুষ হতে পারে না। দেহের খোরাক মা-বাপ কোন রকমে জুগিয়ে থাকেন কিন্তু মনের খোরাক জোগাবার সাধ্য লাখে একজন মা-বাপেরও নেই, সে খোরাক জোগায় লেখক আর শিল্পীরা। দৈহিক খোরাক গ্রহণের যে আধার তা অত্যন্ত

সীমিত ও সংকীর্ণ—তার প্রয়োজন মিটানো তেমন দুঃসাধ্য নয় কিন্তু মনের খোরাকের যে আধার তার কোন অবয়ব নেই, তা অসীম আর অশেষ। তাই তার খোরাকেরও কোন সীমা-পরিসীমা নেই। এ কারণেই ব্যক্তিজীবন থেকে শিল্প-সাহিত্য অনেক বড়। এ বড়র জোগান দেওয়াই মুস্কিল। এ মুস্কিল আসান করেন কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকরা। সামান্য ডাল-ভাত দিয়ে দেহের ক্ষুধা নিবৃত্ত করা যায় কিন্তু দু'চারটা বই-পুস্তক, কি দু'চারখানা ছবি দিয়ে কিম্বা দু'চারটা কবিতা কি গান দিয়ে মনের পরিতৃপ্তি সাধন করা যায় না। এজন্য চাই অনেক অনেক শিশুমনের উপযোগী বই, ছবি, ছড়া, কবিতা, গান। চাই বিচিত্র রকমের, বিচিত্র বিষয়ের আর নানা ভাবের নানা রঙে বিচিত্র বই। বলা বাহুল্য মনের খোরাক তথা চাহিদার কোন দিগ-দিগন্ত নেই। তাই মানব-কল্পনায় যত বিষয় ধরা দেয়, যা শিশুদের মনের বিকাশ আর কৌতূহলের অনুকূল, তার সব কিছু সম্বন্ধেই বই চাই, ছবি চাই, চাই ছড়া, কবিতা, গান।

আমাদের আজাদী-উত্তর সাহিত্য শিল্পের আয়ু খুব বেশী নয় ফলে এসবের অনুকূল পরিবেশ এখনো ব্যাপকভাবে গড়ে উঠেনি। তবুও এ সীমিত সুযোগ-সুবিধার সদব্যবহার যতটুকু সম্ভব আমাদের শিল্পী সাহিত্যিকরা করে চলেছেন। আজকের এ গ্রন্থমেলা ও চিত্র-প্রদর্শনীতে তার কিছু কিছু নমুনা আপনারা দেখতে পাবেন। দেখে আশ্বস্ত হবেন তা মোটেও নিরাশ হওয়ার মতো নয়।

বই বা ছবি কিছুমাত্র যান্ত্রিক ব্যাপার নয়। এসব যে খোরাক ও আনন্দ পরিবেশন করে তাও যান্ত্রিক নয়। বই আর ছবি লেখক আর শিল্পীদের সৃষ্টি-কর্মেরই অংশ এসব বহন করে ওঁদের সৃষ্টিশীলতার স্বাক্ষর। তাই বই আর ছবি শিশুদের মনের ভিতরকার সুপ্ত সৃষ্টিশীল প্রবণতাকেও দোলা দেয়—তার বিকাশে করে সহায়তা। মনে মনে সব শিশুই স্রষ্টা—বই আর ছবি সে ক্ষুদে স্রষ্টাকে জাগিয়ে তোলে, পরিবেশন করে তার অনুকূল খাদ্য। বই আর ছবির এ হচ্ছে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর মূল্যবান অবদান।

চট্টগ্রামের 'শিশু সাহিত্য বিতান' দেশের শিশুদের প্রতি সচেতন ও সহৃদয় দায়িত্ববোধ নিয়ে শিশুমনের উপযোগী খোরাক জোগাতে এগিয়ে এসেছেন। আজকের এ গ্রন্থমেলা আর চিত্র প্রদর্শনীও তাঁদের শ্রম আর উদ্যোগেরই ফল। শিশু আর শিশুদের অভিভাবকদের পক্ষ থেকে তাঁদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দেশের শিশুদের মানস খোরাক জোগাতে আমাদের

যে-সব কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদের বিশিষ্ট কয়েকজন আজ এখানে উপস্থিত আছেন—উপস্থিত সবাইর পক্ষ থেকে আমি তাঁদেরও সাদর সম্ভাষণ ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।*

পেপারব্যাক্ পুস্তক প্রদর্শনী

যাঁহারা আজ এ পুস্তক প্রদর্শনী উদ্বোধনে শরিক হয়েছেন, তাঁদেরকে আমি সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

আমেরিকার তথ্য সরবরাহ কেন্দ্র চট্টগ্রাম শাখা, আজকের এ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন, যার নাম দিয়েছেন তারা 'দি ওয়ার্লর্ড অব পেপার ব্যাক্স্'

আজ যোগাযোগ ব্যবস্থার অকল্পনীয় উন্নতির ফলে একদিকে পৃথিবী নিকটতর হয়েছে অন্যদিকে প্রাণের সীমারেখা গেছে অসম্ভব বেড়ে। তথ্যগত ও ভাবগত এই দুই ক্ষেত্রে জ্ঞান আজ অসীমের অভিসারী।

এ অভিযাত্রায়, আধুনিক বিশ্বে আমেরিকার এক বিশিষ্ট স্থান। আমেরিকা নতুন দেশ, তার সাহিত্য-সংস্কৃতি-সভ্যতা সবই নতুন পথের দিশারী। নতুনের একটি মস্ত বড় সুবিধা এটা যে অতীতের পিছুটানে তার চলার গতি শ্লথ নয়—অতীত সংস্কারের শত শত বেড়া ভাঙ্গার জন্য তাকে অযথা করতে হয় না শক্তিক্ষয়। ফলে পূর্ণ শক্তি নিয়ে সে দিগ্বিজয়ের পথে এগিয়ে যেতে পারে—ব্যবহারিক ক্ষেত্রের চেয়েও ভাবের ক্ষেত্রে এ দিগ্বিজয়ের মূল্য অনেক বেশী। ভাবের ক্ষেত্রে আমেরিকার দিগ্বিজয়ের কিছু পরিচয় আজকের এ প্রদর্শনীতে আপনারা দেখতে পাবেন।

আমেরিকার কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক আর ভাবুকরা কি ভাবছেন, জীবনকে কি ভাবে দেখছেন, ভবিষ্যতের কি স্বপ্ন-কল্পনা তাঁদের মনে আলোড়ন তুলেছে নিঃসন্দেহে তার প্রতিফলন ঘটেছে আজকের এ প্রদর্শনীতে পরিবেশিত অনেকগুলি বইতে। আমেরিকার ভাব-সম্পদের খানিকটা অন্ততঃ এ বইগুলিতে দেখা যাবে।

বলাবাহুল্য সব জাতিরই শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তার ভাব-সম্পদ, যা বিধৃত হয় বই, পুস্তক ও কেতাবে। আর সব জাতির সভ্যতারও শ্রেষ্ঠ অংশ এগুলি। বস্তুগত সম্পদের ক্ষয় আছে, লয় আছে, ভাব-সম্পদ সে প্রাকৃতিক বিধানের বাইরে। তাই সব সভ্য জাতি গ্রন্থ আর গ্রন্থাগারের জন্য তার প্রচার-প্রসার আর সংরক্ষণের জন্য এত প্রচুর অর্থব্যয় করে থাকে।

---

* চট্টগ্রাম, ১৯৬৭

আমেরিকা আজ উন্নতশীল দেশসমূহের শীর্ষ দেশে—ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমেরিকার অভূতপূর্ব সাফল্য আমাদের অজানা নয়—কিন্তু চিন্তা ও রসের ক্ষেত্রে আমেরিকার যে অবদান তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় এখনো তেমন নিবিড় নয়। এ ধরনের প্রদর্শনী ও পাঠাগার তেমন পরিচয় সাধনের যে অত্যন্ত সহায়ক তাতে সন্দেহ নেই। এদিক থেকে যে-কোন পুস্তক প্রদর্শনীর মূল্য অপরিসীম। আমাদেরও উন্নয়নশীল দেশ কিন্তু বই-পুস্তকের ক্ষেত্রে আমাদের উন্নতি আজও তেমন লক্ষ্যগোচর নয়। এ সব প্রদর্শনীতে আমাদের শেখা ও জানার অনেক কিছু আছে -এতে যে শুধু এক উন্নত সাহিত্যের ভাবগত দিকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সহজ করে তা নয়, বই-পত্রের প্রকাশনা আর অঙ্গসজ্জা ও এক মূল্যবান শিল্প, তার সম্বন্ধেও আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান এতে বৃদ্ধি পায়।

আজকের প্রদর্শনীর বিশেষত্ব 'পেপারব্যাক্‌স্' বই'র আধিক্য। মূল্যবান বই কাগজের মলাটে সস্তায় পরিবেশনের এ পন্থা, সম্ভবতঃ আমেরিকারই অবদান—এতে জ্ঞান সহজলভ্য হয়েছে, অনেক দামী বই এখন এর ফলে সাধারণ স্বল্প আয়ের মানুষের ক্রয় ক্ষমতার আয়ত্তাধীনে এসে গেছে। জ্ঞান তথা সাহিত্যের ব্যাপক প্রসারের পথে এ এক বিরাট পদক্ষেপ।

জ্ঞান আজ কোথাও কোন দেশে কোন ভূখণ্ডে সীমিত হয়ে নেই আলো হাওয়ার মতো জ্ঞানের মালিকান সব দেশের সব মানুষের। তার প্রথম উৎসরণ যেখানেই হোক। সব রকম জ্ঞানের প্রতি আমাদেরও এ দৃষ্টি আয়ত্ত করতে হবে। জ্ঞানের বর্তিকা যেখান থেকেই আসুক তাকেই আমরা স্বাগতম্ জানাবো।

তাই আমেরিকার তথ্য সরবরাহ কেন্দ্র আয়োজিত আজকের এই পুস্তক প্রদর্শনীকেও আমরা স্বাগতম জানাচ্ছি। যারা এ আয়োজনের পেছনে, এখানকার পাঠক আর গ্রন্থানুরাগীদের পক্ষ থেকে তাঁদেরে জানাচ্ছি ধন্যবাদ। এ কয়টি কথা বলে আমি 'দি ওয়ার্লড অব পেপারব্যাক্‌স্' পুস্তক প্রদর্শনীর উদ্বোধন ঘোষণা করছি। ধন্যবাদ।*

* চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত শিশু গ্রন্থমেলা ও চিত্র প্রদর্শনীতে এবং আমেরিকার তথ্য সরবরাহ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত 'দি ওয়ার্লড অব পেপার ব্যাক্‌স্'এর প্রদর্শনীতে প্রদত্ত ভাষণ।

জীবনের একটি স্মরণীয় অধ্যায়

ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে আমার জীবনের একটি বছর কেটেছে। সে ১৯২৯/৩০ এর কথা। গোড়ায় শিক্ষক হওয়ার তেমন আগ্রহ আমার ছিল না। পিতার আগ্রহ আর নির্দেশে এবং কিছুটা অবস্থার ফেরে প'ড়ে আমাকে গ্রহণ করতে হয়েছিল শিক্ষকের জীবন। এ জীবনের জন্য তৈরির প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আমি ভর্তি হয়েছিলাম ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে। তখন সারা প্রদেশে দু'টি মাত্র ট্রেনিং কলেজ ছিল। ঢাকারটি ছাড়া অন্যটি ছিল কলকাতায়, নাম ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ। এ দু'টি থেকে পাস ক'রে বেরুলে পাওয়া যেতো বি. টি. ডিগ্রী অর্থাৎ বেচিলার অব টিচিং। এখন বোধ করি বলা হয় বি. এড্ বা বেচিলার অব্ এডুকেশন।

ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ রাজধানী কলকাতায় অবস্থিত হলেও খ্যাতি আর নামডাক ছিল ঢাকা ট্রেনিং কলেজের। এ খ্যাতির মূলে ছিলেন অধ্যক্ষ ডক্টর মাইকেল ওয়েস্ট, তিনি আই. ই. এস. অর্থাৎ ভারতীয় শিক্ষা সার্ভিসের লোক ছিলেন। শিক্ষা আর প্রশিক্ষণ সম্বন্ধে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর গবেষণায় তিনি জীবন অতিবাহিত করেছেন। তাঁর Language in Education একটি সুবিখ্যাত বই। এ বইতে শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার স্থান সম্বন্ধে তাঁর গবেষণার ফলাফল ও সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর একটি মূল্যবান উক্তি হচ্ছে: The teacher of mother tongue is born, not made. যাদের মাতৃভাষা ইংরেজী নয় তাদের New Method পদ্ধতিতে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার তিনি প্রবক্তা এবং এ বিষয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে তিনি বহু পাঠ্য-পুস্তক রচনা করেছেন। ডক্টর ওয়েস্ট একনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতী ও

প্রশিক্ষণ-ব্যাপারে পাকা বিশেষজ্ঞ ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁর জন্যই ঢাকা ট্রেনিং কলেজের সুনাম সেদিন সারা ভারতময় ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে, এমন কি সুদূর মাদ্রাজ, মহীশূর, হায়দ্রাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর থেকেও শিক্ষার্থীরা এ কলেজে ভর্তি হতেন। ঐ সব দেশের সরকারই ওদের পাঠাতো। এ কলেজে আসামের জন্য একটা নির্দিষ্ট কোটা ছিল। সে যুগে আসামের সব ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষকই ছিলেন এ কলেজের ছাত্র। ওয়েস্ট সাহেব বেশ সুরসিক ছিলেন, তঁকে ক্রুদ্ধ হতে আমি কখনো দেখিনি। তার ক্লাসে কোন ছাত্র অন্যমনস্ক হ'লে কিংবা ঝিমুতে থাকলে তিনি হাতের চক থেকে এক টুকরা ভেঙে নিয়ে তাক ক'রে তাই ছুঁড়ে মারতেন সে ছাত্রকে লক্ষ্য ক'রে। ট্রেনিং কলেজের ছাত্র মানে সে যুগে সবাই প্রায় বয়স্ক মানুষ, বিবাহিত আর সন্তান-সন্ততির জনক। মিসেস ওয়েস্টও সাময়িক ভাবে আমাদের হাইজিন বা স্বাস্থ্যবিদ্যা পড়াতেন। শুনেছিলাম, তিনি নাকি বিবাহ-পূর্ব জীবনে ধাত্রী ছিলেন। ব্ল্যাক বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে অবলীলাক্রমে মানব-দেহের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ছবি এঁকে তিনি আমাদের দেহতত্ত্ব শিক্ষা দিতেন। এমন কি নরনারীর গোপন-অঙ্গও তাঁর অংকনশিল্প থেকে বাদ পড়তো না! এসব পড়াতে কিংবা আঁকতে তাঁকে কোন রকম সংকোচ কি লজ্জা বোধ করতে দেখেনি। হাত-পা, চোখ-কানের মত এ সবও তাঁর কাছে অতি স্বাভাবিক ও প্রাকৃত ব্যাপার ছিল। হয়তো ও দেশের সমাজ-জীবন আর শিক্ষারই এ ফল।

ওয়েস্ট-দম্পতির দু'জনের দু'খানা ছোট অস্টিন গাড়ী ছিল। যাঁর যাঁর ক্লাসের সময় নিজের গাড়ী নিজে ড্রাইভ ক'রে তাঁরা আসতেন কলেজে। একদিন দেখি ডক্টর ওয়েস্ট দোতালার সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে ঘন ঘন হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন। একটু আগে বেল পড়েছে, মিসেস ওয়েস্টের ক্লাস। তিনি কাঁটায় কাটায় এসে পৌছোন নি আজ, যা তিনি রোজ করেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঊর্ধ্বশ্বাসে সিঁড়ি ভেঙ্গে মিসেসকে উঠে আসতে দেখা গেল, ওয়েস্ট সাহেব কয়েক ধাপ নেমে ঘড়ি-শুদ্ধ হাতের কব্জিটা সোজা মিসেসের চোখের সামনে তুলে ধরলেন। মুখে বললেন না একটি কথাও। লজ্জিতা মিসেস ওয়েস্ট সরি, সরি বলতে বলতে ছুটে এসে ক্লাসে ঢুকলেন। লজ্জায় লাল হতে তাঁকে সেদিনই শুধু দেখেছিলাম।

তখন ঢাকা ট্রেনিং কলেজ ছিল আরমানীটোলায়। অনতি-বৃহৎ একটি দোতালা লাল বিল্ডিং, নীচে আরামানীটোলা হাই স্কুল আর

উপরে ট্রেনিং কলেজ বসতো। কলেজে যেমন স্কুলেও সীট ছিল নির্দিষ্ট। এ স্কুল পরিচালিত হতো ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষের কর্তৃত্বাধীনে। ট্রেনিং কলেজের ছাত্রদের প্র্যাকটিস টিচিঙের উদ্দেশ্যেই এ স্কুল করা ও রাখা। হাতে-কলমে শিক্ষাদান ছাড়া শিক্ষকের প্রশিক্ষণ কখনো সম্পূর্ণ আর যথাযথ হতে পারে না। তাই স্কুল ট্রেনিং কলেজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমাদের সময় ওয়েস্টেব পরে সহ-অধ্যক্ষ ছিলেন মনোরঞ্জন মিত্র। ছোটখাটো লোক, ছাড়া ছাড়া ইংরেজী বলতেন। খুব সম্ভব তিনি Educational Psychology পড়াতেন। তারপর ছিলেন গুরুবন্ধু ভট্টচার্য, তিনি দীর্ঘদেহ, গুরু-গম্ভীর ও সুদর্শন ছিলেন। তবে মাথায় ছিল প্রকাণ্ড টাক। তখন দুটো ক'রে Teaching Subjects নিতে হতো ছাত্রদের। আমি নিয়েছিলাম বাংলা আর ইতিহাস। এ দুটো বিষয় গুরুবন্ধু বাবু পড়াতেন। কাজেই তাঁর সংগে মেলামেশাটা বেশী হতো। একবার Tutorial কাজ হিসাবে তিনি শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' বইটা আমাদের দিয়ে নাট্যরূপ করিয়েছিলেন। এবং কলেজের বার্ষিক নাটক হিসাবে তা সে বৎসর অভিনীতও হয়েছিল। আমাকে নিতে হয়েছিল আকবর সরদারের ছেলের পার্ট। চাটগাঁয়ের লোক, আমার উচ্চারণ তেমন বিশুদ্ধ ছিল না, যদিও আমার পার্ট ছিল অতি সংক্ষিপ্ত, তবুও আমাকে তালিম দিতে গুরুবন্ধু বাবুকে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। মনে পড়ে মা-ঠাকরুণের অপভ্রংশ 'মাঠান' সম্বোধনটা আমার মুখ দিয়ে কিছুতেই যথাযথভাবে বেরুচ্ছিল না। আর গুরুবন্ধু বাবুর কি বিরক্তি আর আমাকে নিয়ে কি মাথা কুটুনি! তখনো সহ-অভিনয়ের রেওয়াজ হয়নি (ছাত্রীই ছিল না), ছেলেরাই মেয়েদের পার্ট করতো। বিজয়ার পার্ট করেছিল আমাদের এক সহপাঠী, শুধু যে চমৎকার ভাবে করেছিল তা নয়, ওর অভিনয় হয়েছিল অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। একটা আস্ত বেটা ছেলে যে অমন নিখুঁতভাবে মেয়ের পার্ট করতে পারে তা ভাবা যায় না। ছেলে কি মেয়ে কর্তৃক বিজয়ার সকরুণ অমন সুঅভিনয় আমি আর কখনো দেখিনি। বিজয়ার সকরুণ মূর্তি আজো যেন আমি চোখের সামনে দেখতে পাই। বাংলা ক্লাসের টিউটরিয়াল হিসাবেই আমার 'চোর' গল্পটি লেখা হয়েছিল। গুরুবন্ধু বাবু সংকেত হিসেবে চোর, দলিল, ডিটেকটিভ, এ তিনটি শব্দ দিয়ে বলেছিলেন একটি গল্প লিখতে।

তারই পরিণতি ঐ 'চোর'। পরে গল্পটি 'মাসিক মোহাম্মী'তে ছাপা হয়েছিল। মুসলিম হোস্টেলের জন্য একজন সুপারিনটেনডেণ্ট বা তত্ত্বাবধায়ক দরকার। সে জন্যই বোধ করি একজন ক'রে মুসলমান অধ্যাপক থাকতেন কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলীতে। আমাদের সময় ছিলেন জনাব মুখলেসর রহমান। সুখের বিষয়, তিনি আজো বেঁচে আছেন। অবসর গ্রহণ করেছেন বিভাগীয় ইন্সপেক্টর হিসেবে। তিনি ছিলেন কলেজ লাইব্রেরীর আর কমন-রুমের ভারপ্রাপ্ত, হস্টেলের সুপারিনটেনডেণ্ট আর খেলার সাথী হিসেবে তাঁর সাথেই ছিল আমাদের অধিকতর ঘনিষ্ঠতা। তিনি থাকতেনও হস্টেলে আমাদের ইনডোর গেমস রুমের পাশের কামরায়। তিনি হাতিয়ার লোক। বেটে-খাটো সুদৃঢ় গড়ন আর হাসিখুশী মেজাজের মানুষ। কোন খেলা-ধুলায় তার অরুচি ছিল না। লম্বা দাড়ি নিয়ে হকি, ফুটবল থেকে টেনিস, পিংপং, কেরম সবই খেলতেন আর সবটাই ভালো খেলতেন। কেরম, পিংপঙেও তাঁকে আমরা হারাতে পারতাম না কোনদিন। নামায-রোজায় ছিলেন পাবন্দ্ আবার সুযোগ মতো হারমোনিয়ম নিয়ে পেঁ পোঁও করতেন। রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলের অনেক কবিতাও পারতেন মুখস্থ আউড়াতে। মনে হয় দাবা খেলতেও পারতেন। অমন 'অষ্টধাতী' লোক কম দেখা যায়। শুনি আজো তিনি যাপন করছেন কর্ম-চঞ্চল জীবন। ডিক্টাফোন কি মেগাফোন এ জাতীয় এক যন্ত্র দিয়ে আমাদের ইংরেজী উচ্চারণ শেখানো হতো। ঐ রকম যন্ত্র এর আগে আর কখনো দেখিনি। এ ক্লাসটার ভার ছিল হেম ব্যানার্জি বলে এক অস্থায়ী লেকচারারের উপর। এটার জন্য কণ্ঠনালীর অনেক কসরতের দরকার হতো। অশ্বিনী দত্ত পড়াতেন Educational Measurement, ভূগোল আর অংক, শরৎবাবু শেখাতেন ড্রয়িং। একজন ড্রিল-মাস্টারও ছিলেন, খুব সম্ভব তিনি স্কুলেও ড্রিল শেখাতেন। নাম ভুলে গেছি। মোটামুটি এই ছিল অধ্যাপকমণ্ডলী। হস্টেলে থাকতাম, হস্টেলের চারিদিকের পরিবেশ নয়ন-মুগ্ধকর ছিল, বাগান ছিল, সর্বত্র নানা ফুলের গাছ ছিল ছড়িয়ে। হাউজের জলে উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়িয়ে গোসল করাও তখন বেশ 'আরামপ্রদ মনে হতো। হাউজের অনতিদূরেই ছিল রান্না আর খাবার ঘর। খাবার টেবিলটার কাপড়জল সুরায় সব সময় নোংরা থাকতো, ঢুকলেই নাকে একটা ভ্যাপসা গন্ধ এসে ঢুকতো। আমার 'কবিতার কাঁটা'

নায়ক গল্পে এর ছায়া পড়েছে, 'খেয়ালের খেলা' গল্পটিও ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের পরিমণ্ডলে লেখা, যদিও কলেজ জীবনের কোন আভাস তাতে নেই। আমার ঘরের বারান্দা থেকে বস্তি আর বস্তি-জীবনের কিছু কিছু দেখা যেতো। মনে হয় 'একখানি হাসি' গল্পেও আমার জীবনের এ অধ্যায়ের কিছু আভাস দেখা যাবে। শহরের কোলাহল থেকে দূরে ছিল ব'লে কলেজ আর হস্টেল দুই-ই আমার খুব প্রিয় ছিল। আমার ঝোঁক ছিল সাহিত্যের দিকে, পাঠ্য-তালিকার নীরস বইগুলির প্রতি যথাযথ মন দেওয়া আমার পক্ষে তাই সম্ভব হয়নি। ফলে প্রথম বছরে প্র্যাকটিকেলে পাস করলাম বটে কিন্তু থিয়োরিটিকেলে তথা কেতাবীবিদ্যার পরীক্ষায় ফেল্ করে বসলাম। কাজেই পুরোপুরি বি. টি. হতে আমাকে আরো এক বছর অপেক্ষা করতে হলো।

আমার এ সংক্ষিপ্ত স্মৃতি কথার নাম দিয়েছি আমি 'জীবনের একটি স্মরণীয় অধ্যায়'। নামটা নিরর্থক দিইনি। সত্যই ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের জীবন আমার কাছে স্মরণীয় হ'য়ে আছে। এখানে এমন কিছু বিষয়ের সংগে আমি পরিচিত হয়েছি, যার সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমার কোন ধারণাই ছিল না। এতকাল স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ কোন কোন বিষয়ে আমি অধ্যয়ন করেছি এবং আমার সমস্ত বিদ্যা তাতেই ছিল সীমিত। বিদ্যার যে আরো নানা দিক আছে যার সংগে মানুষের শিক্ষা আর বিকাশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, শিশুর মানসিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরে এমন সব বিষয় রয়েছে যার জ্ঞান ছাড়া শিক্ষাদান ত্রুটিপূর্ণ থেকে যেতে বাধ্য, বিশেষতঃ শিশু-মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান শিক্ষকের জন্য যে একান্তই অপরিহার্য, এ প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের চৌকাঠ না মাড়ালে আমার কাছে এসব অজ্ঞাতই থেকে যেতো। শিক্ষা আর শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণার ফলাফল, এমন কি শিশুর স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তিরও যে পরিমাপ করা যায়, সব শিক্ষার আর প্রত্যেকটা নির্দিষ্ট পাঠেরও যে উদ্দেশ্য রয়েছে আর সে উদ্দেশ্য হাসিল ছাড়া যে-কোন শিক্ষাই যে ফলপ্রসূ হতে পারে না, এ সবের সংগেও আমি পরিচিত হয়েছি ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে এসে। এ সবের যথাযথ জ্ঞান ছাড়া শিক্ষা কখনো বিজ্ঞান-ভিত্তিক ও সার্থক হতে পারে না। শিক্ষকের জন্য এসব জ্ঞান অপরিহার্য। শিক্ষক হিসেবে আমার যেটুকু সাফল্য তার পেছনে ট্রেনিং কলেজ-আহৃত জ্ঞানের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।' এজন্য আমার জীবনের এ অধ্যায়টাকে আমি আজো স্মরণীয় মনে ক'রে থাকি।

আইন ও আইনের কথা

আইন পেশার সম্পূর্ণ বাইরের মানুষ হয়েও আমি যে আজ আইন কলেজের ছাত্রদের অভিষেক উৎসবে কিছু বলতে রাজী হয়েছি তা একেবারে অহেতুক নয়। শুনে আপনারা হয়তো বিস্মিত হবেন, ছাত্র-জীবনে আমারও প্রবল শখ ছিল আইন ব্যবসায়ী হওয়ার। বি. এ. পাস করার পর সত্যি সত্যি বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে কলকাতার এক ল' কলেজে আমিও ভর্তি হয়েছিলাম। ঢাকা না গিয়ে কলকাতা যাওয়ার বড় কারণ, ওখানে দিনের বেলা কোথাও কাজ করে রাত্রে ল' পড়া চলতো—যেমন আপনারা অনেকে করে থাকেন এখন। আর চলতো দিনের পর দিন প্রক্সি দিয়ে কলেজের খাতা-পত্রে ছাত্র থেকে যাওয়া। ব্যাপারটা ছিল সে যুগেও ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Open Secret—অবিকল তাই। তাতে কর্তৃপক্ষেরও কোন মাথাব্যথা ছিল না—ছাত্রদের ত কথাই নেই। অধ্যাপকরা নিয়মিত মাইনে পেয়ে অধ্যাপক থেকে যেতেন সারা বছর, আর ছাত্ররা নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে মাইনে দিয়ে বছরের পর বছর থেকে যেতো ছাত্রই। এভাবে অনেকের সামনে আইন ব্যবসায় পথ যে শুধু খুলে যেতো তা নয়—অনেকে পাস করে বেরুবার আগেই প্রক্সি দেওয়াটাকেও একটা লাভজনক ব্যবসা করে নিতো। এভাবে অধ্যাপক আর ছাত্রের মৌন সম্মতিতে একটা চমৎকার সহ-অবস্থান ওখানে গড়ে উঠেছিল। আমিও স্রেফ ঐ সুযোগের লোভেই ঢাকার গ্রেজুয়েট হয়েও কলকাতা গিয়েছিলাম ল' পড়তে। আর এত বলার দরকার করেনা, বাড়ী থেকে পালিয়ে যাওয়ার মানে বাড়ী থেকে খরচ পাওয়ার পথও বন্ধ হওয়া। অধিকন্তু সে যুগে কলকাতাই ছিল চাকরির বড় বাজার। কাজেই ঐ অবস্থায় আমার পক্ষেও কলকাতা না গিয়ে উপায় ছিল না।

পেশার বাইরে আইনের যে একটা বিরাট তাৎপর্য আর গুরুত্ব রয়েছে, তখন তা যে আমি তেমন উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম তা নয়—তবুও যে আইন ব্যবসার দিকে আমার মন ঝুঁকেছিল তার বড় কারণ তখন আমাদের সামনে বিশেষতঃ রাজনীতি ক্ষেত্রে যে-সব খ্যাতনামাদের আমরা দেখতাম, সংবাদপত্র আর সভাসমিতিতে যাঁদের নাম অহরহ মুখরিত হতো তারা ছিলেন প্রায় সবই আইনের লোক—তথা আইন ব্যবসায়ী। স্বাধীনতা আন্দোলনে তারাই ছিলেন বড় অংশীদার আর অগ্রণী। দেশ আর জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকারীও তারাই তুলে নিয়াছিলেন নিজের হাতে। সে সঙ্গে এও মনে হতো এর চেয়ে স্বাধীন পেশা আর নেই। এ সব কারণে আইন ব্যবসার প্রতি আমার মতো নিরীহ মানুষের মনেও একটা অদম্য আকর্ষণের সঞ্চার হয়েছিল। নিজের বাড়ীর সামনে নিজের নামের পাশে বি. এ. বি. এল. (তখনো এল এল. বি-র 'শুরু হয়নি) লেখা একটা সাইন বোর্ড সব সময় ঝুলছে বারান্দায় টাঙানো। কল্পনায় সে দৃশ্যটাও কম লোভনীয় ছিল না আমার কাছে।

কিন্তু বাধ সাধলেন মুরুব্বিরা। মুরুব্বি মানে আমার পিতা। তিনি ছিলেন আলেম—শুধু যে কঠোর নিষ্ঠাবান ধার্মিক ছিলেন তিনি তা নয়, ছিলেন সরল-সোজা এক কথার মানুষ। আইন ব্যবসা তথা ওকালতিকে তিনি কিছুতেই আলেম-সন্তানের উপযুক্ত পেশা মনে করতেন না। এ সম্পর্কে তার অনমনীয় মনোভাব অনেকের অনেক চেষ্টা তদবীরেও কিছুমাত্র নড়ানো সম্ভব হয়নি। মামলা-মোকদ্দমায় তিনি দেখতে পেতেন দুইপক্ষ—আসামী-ফরিয়াদি দোষী আর নির্দোষী, আর দেখতে পেতেন উকিলরা দুইপক্ষেরই কেস নিয়ে থাকেন, নিয়ে থাকেন সেভাবে ফিও। এমন কি দেখা যায় সন্দেহ খুনিরও উকিলের অভাব হয় না। তার শরীয়ৎ-লালিত মন আর ধর্ম-বুদ্ধি এখানে কোন আপস খুঁজে পেতেন না, আপস করতেনও না তিনি ধর্মীয় কোন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপারে। অগত্যা আমাকে নতি স্বীকার করতে হলো একদিন। ছ মাস ব্যর্থ চেষ্টার পর গোটা একটা বছর নষ্ট করে আইন পড়া ছেড়ে এবার ফিরে আসতে হলো তার নির্বাচিত পেশা শিক্ষকতায় আমাকে।

তাই উকিল হওয়া আর ঘটলো না আমার জীবনে কোনদিন—নিজের ঘরের সামনে নিজের নামের পেছনে পেশাগত বিদ্যার ছাপ মারা সাইন-বোর্ড দেখে আপনাদের মতো রোজ রোজ পুলকিত হয়ে ওঠার সুযোগ

আমি আর পেলাম না জীবনে। এদিক দিয়ে আপনারা আমার চেয়ে অনেক সৌভাগ্যবান। তাই আপনাদের য়ুনিয়নের আজকের অভিষেক দিনে শুধু নির্বাচিতদের নয়, আপনাদের সবাইকে যাঁদের ভোট ছাড়া এঁরা নির্বাচিত হতে পারতেন না, তাদেরও অভিনন্দন জানাচ্ছি। যশ, খ্যাতি আর আর্থিক সম্পদে আপনাদের জীবন পূর্ণ হয়ে উঠুক। আপনাদের ঘরের সামনে ঝুলানো এল. এল. বি. লেখা সাইন-বোর্ড অক্ষয় হোক।

কালের দীর্ঘ ব্যবধানের ফলে আমার ব্যক্তিগত ব্যর্থতার দুঃখ আর এখন বোধ করি না, তবে মাঝে মাঝে দেশে-বিদেশে আইনের ব্যর্থতা দেখে আমি বিচলিত বোধ না করে পারি না। কারণ কালক্রমে আইন সম্বন্ধে আমার ধারণা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আইনকে আর এখন আমি স্রেফ পেশাগত হাতিয়ার মনে করি না। বয়স আর অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সাথে সাথে যখন চারদিকের সমাজ আর রাষ্ট্র সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছি—সভ্যতা আর সংস্কৃতি সম্বন্ধে যখন শুরু করেছি ভাবতে তখন থেকেই বুঝতে পেরেছি সব রকম সভ্যতা আর সংস্কৃতি, আইন আর আইনের শাসনেরই ফলশ্রুতি। জেনেছি আইন আর আইনের শাসন ছাড়া সুস্থ সমাজ-জীবন অচল। যে দেশে আইন আর আইনের শাসন নেই—আমাদের ভাষায় সে দেশকেই বলা হয় 'মগের মুল্লুক'। সব সভ্যতা আর সভ্য জীবনেরও মূল বুনিয়াদ আইন। আমার বিশ্বাস—আইন মানব-মনীষার সর্বোত্তম আবিষ্কার। আইন রচনার যেমন, তেমনি প্রয়োগের দায়িত্বও কিন্তু রাষ্ট্রের। আইন সার্বিক, সামগ্রিক আর নৈর্ব্যক্তিক—তার চোখে ব্যক্তি বা ব্যতিক্রম নেই। আইন-রচয়িতাও আইনের অধীন—রচয়িতার যেমন তেমনি প্রয়োগ কর্তারও অধিকার নেই আইনের সীমা লংঘনের। এখানেই আইনের মহত্ব আর আইনের শাসনের মূল্য ও গুরুত্ব। আইন বস্তুগত বটে কিন্তু পুরোপুরি মানবিক। যা মানুষের জন্য আর মানুষের দ্বারাই রচিত তা সর্বতোভাবে মানবিক না হলে তার উদ্দেশ্যই হয়ে যায় ব্যর্থ। নিক্তিকে যে আইনের তথা বিচারের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয় তা যথার্থ, ওজন তথা নিরপেক্ষতার ভারসাম্য রক্ষিত না হলে আইন আর আইন থাকে না, হয়ে পড়ে পক্ষপাতদুষ্ট বা নির্যাতন। এ দু'য়ের কোনটাই আইন বা আইনের শাসন নয়।

ক্ষমতা আর আইনের মধ্যে চিরকাল একটা অহি-নকুল সম্পর্ক রয়েছে। অবাধ ক্ষমতা আইনের প্রধানতম শত্রু। এ শত্রুকে নিয়ন্ত্রিত করা আর

রাখা আইনের এক প্রধান লক্ষ্য—এ লক্ষ্য হাসিলে ব্যর্থ হলে আইন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তখন আইনের শাসনের ভরাডুবি অনিবার্য। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত উন্নয়নশীল দেশের সামনে আজ এটিই সবচেয়ে বড় সমস্যা। কারণ এসব দেশে অবাধ ক্ষমতা দখল তেমন দুঃসাধ্য কিছু নয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ধ্যান-ধারণা যেমন এসব দেশে এখনো নড়বড়ে ও অস্পষ্ট, তেমনি আইনের শাসন গড়ে ওঠেনি তেমন দৃঢ়ভিত্তিক হয়ে। আইনের শাসনের পেছনেও প্রয়োজন দীর্ঘ ঐতিহ্যের। শাসক আর শাসিত উভয় পক্ষের অন্তরে এ ঐতিহ্য চেতনা গভীর মূলাশ্রয়ী না হলে অবাধ ক্ষমতা সুযোগ পেলেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দ্বিধা করে না। তখন আইন হয়ে পড়ে নির্যাতনের হাতিয়ার।

আমাদের বাংলাদেশও সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ও উন্নয়নশীল দেশ। আমাদেরও আজ এটি এক বড় সমস্যা অর্থাৎ আইনের শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সমস্যা। অপরাধের সঙ্গে দণ্ডের সম্পর্ক এক চিরকেলে ব্যাপার। অপরাধ নির্ণয়ের পদ্ধতি আর বিচারের নিয়ম-কানুন আবিষ্কার করতে মানুষকে দীর্ঘ ইতিহাস পার হয়ে আসতে হয়েছে—আইন সমাজের সর্বোত্তম মস্তিষ্কেরই অবদান। নিরপরাধ যাতে দণ্ডিত না হয় আর অপরাধীও যাতে রেহাই না পায় দণ্ডের হাত থেকে বা অপরাধের তুলনায় না পায় বেশী শাস্তি সব রকম আইন-কানুন আর বিচারের এ লক্ষ্য, আইন আর শৃংখলার পথেই ঘটে সভ্যতার অগ্রগতি, আইন আর বিচার যেখানে নিরপেক্ষ, নির্যাতনমুক্ত আর সর্বাধিক মানবিক, সেখানে এ অগ্রগতি হয়েছে অধিকতর সার্থক। নির্যাতন যেমন শাসন নয়, তেমনি তা বিচার নয়, বরং তা বিচার আর শাসনকে করে কলুষিত। আইনের শাসন সভ্যতার এক অপরিহার্য অঙ্গ। যে দেশের আইনের শাসনের প্রতি মানুষের আনুগত্য রয়েছে—শাসকরাও যেখানে আইনকে ভয় আর শ্রদ্ধা করে চলে, সেখানেই বিরাজ করে উন্নততর সভ্যতা। আমরা বাংলাদেশবাসীদেরও স্বপ্ন উন্নততর সভ্যতার ও সভ্য জীবনের। উপস্থিত আইনের নবীন শিক্ষার্থীদেরও মনে এ স্বপ্নের ছোঁয়া লাগুক। আইনের স্রেফ পেশাগত সুযোগ-সুবিধার কথা না ভেবে আপনারা বৃহত্তর দেশ আর সমাজের কথাও ভাবুন। দেশে যাতে আইন আর আইনের শাসন পুরোপুরি কায়েম হয় আপনাদের সচেতন প্রয়াস সেই লক্ষ্যাভিমুখী হোক—আজকের দিনে আপনাদের সকলের প্রতি এটাই আমার আন্তরিক নিবেদন। আর একটি কথা—আমাদের

দেশের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র, আইনের আশ্রয় আর নিরাপত্তা তাদের জন্য এখন ভয়ানক দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে। নবীন আইনজীবীদের এ সম্বন্ধে সচেতন, উদার আর সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত। আইন সহজ-লভ্য না হলে—বিশেষতঃ দেশের বৃহত্তর জনতার কাছে, আইনের শাসন কিছুতেই সর্বব্যাপক হতে পারবে না। চট্টগ্রাম আইন কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক আর ছাত্রদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।*

---

* চট্টগ্রাম আইন কলেজ ছাত্র সংসদের অভিষেক উৎসবে প্রদত্ত ভাষণ

দু'জন স্মরণীয় জ্ঞান-সাধক

প্রাচীন মুসলিম জ্ঞান-সাধকদের সাধনা সব সময় স্বসমাজ বা স্বধর্মে সীমিত ছিল না। বিশেষ করে মধ্য এশিয়ায় এমন কিছুসংখ্যক মুসলিম মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁরা অন্যদেশ-ধর্ম সম্বন্ধেও গভীরভাবে কৌতূহলী আর জিজ্ঞাসু ছিলেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার দুস্তর ব্যবধান আর প্রতিকূলতাও তাঁদের অনুসন্ধিৎসার পথে তেমন বাধার সৃষ্টি করতে পারেনি। তেমন একজন দুঃসাহসী জ্ঞানান্বেষী ছিলেন আল্‌বেরুনী—সে যুগের ভারত সম্বন্ধে তাঁর বই আজো নাকি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর সম্বন্ধে বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্ ডক্টর এডোয়ার্ড সি. সাচৌ (Dr. Edward c. Sachau) লিখেছেন :

"The work of Al-beruni is unique in Muslim literature as an earnest attempt to study an idolatrous world of thought not proceeding from the intension of attacking and refuting it, but uniformally showing the desire to be just and impartial, even when the opponents, views are declared to be inadmissible..... it shows that the religious policy of king Mahmud, the great destroyer of Hindu temples and idols, under whom Al-beruni wrote, must have been so liberal as to be rarely met within the annals of Islam."

বলা বাহুল্য এ এক খৃষ্টীয় লেখকের মন্তব্য। তাঁর সব মন্তব্যের সঙ্গে সব পাঠকদের সায় থাকার কথা নয়। কিন্তু বহুনিন্দিত সোলতান মাহমুদ যে বিদ্যা আর জ্ঞানচর্চার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আর এসব ব্যাপারে তাঁর উদারতা যে প্রশ্নাতীত তার স্বীকৃতি রয়েছে এসব মন্তব্যে। তৎকালীন ভারত পুরোপুরিই পৌত্তলিক ছিল আর পৌত্তলিকতার সঙ্গে ইসলামের

অহিনকুল সম্পর্ক সত্বেও মনীষী আল্-বেরুনী ভারত ভ্রমণ করে এ দেশ আর এ দেশের ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম, সংস্কৃতি এসবের অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করতে দ্বিধা করেননি। এ দেশের ধর্ম আর ধর্মীয় আচার-আচরণের সঙ্গে তাঁর নিজ ধর্ম আর আচার-বিচারের সঙ্গে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক না থাকিলেও তিনি কখনো তাঁর নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগি ত্যাগ করেননি। এমন কি বিরুদ্ধ পক্ষের অবিশ্বাস্য দাবীকেও তিনি উপেক্ষা করেন নি বরং যুক্তি বিচারের সাহায্যে তা চেয়েছেন বুঝতে। খণ্ডন করার কিম্বা নিন্দার মনোভাব নিয়ে তিনি তাঁর অধ্যয়ন আর জ্ঞানানুশীলনের পথে অগ্রসর হননি। স্রেফ জ্ঞানের সন্ধানই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ও আদর্শ। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে সোলতান মাহমুদের মৃত্যু ঘটে। কাজেই আল্-বেরুনী যে তাঁর ভারত ভ্রমণ তার আগেই শেষ করছেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। গভীর অধ্যয়ন আর সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা এ দুয়েরই ফল তাঁর 'ইণ্ডিয়া'। এদেশের ধর্ম, দর্শন আর লোকাচার সব কিছুই নিখুঁত আর নিরপেক্ষ ভাবে বর্ণিত হয়েছে তাঁর এ বইতে। এ কারণেই বইটির বিশেষ মূল্য এবং আজো তা প্রামাণ্য ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে স্বীকৃত।

আল্-বেরুনীর পর রশীদ-উদ্দীন নামে আর একজন ভারত বিশেষজ্ঞের নাম পাওয়া যায়। তিনি আরবী আর পার্শী দু'ভাষাতে লিখেছেন। মনে হয় তখন ইরান আর সারা মধ্য এশিয়ার দেশগুলিতে এ দুই ভাষাই যুগপৎ চর্চা হতো বিশেষত বুদ্ধিজীবীদের সংস্কৃতিচর্চা আর মননশীল ক্রিয়া কর্মের বাহন হিসাবে এ দুই ভাষাই হতো ব্যবহৃত।

তখন ঐ সব এলাকায় বৌদ্ধ প্রভাবও নাকি ছিল ব্যাপক। কাশ্মীর ত বটেই এমন কি আমাদের প্রাক্তন সীমান্ত প্রদেশেও ঐ যুগে মধ্য এশিয়ার সামিল ছিল। কাশ্মীরের লদক আজো বৌদ্ধ প্রধান রয়ে গেছে। মঙ্গোলীয়ারও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী প্রচুর। মনে হয় ঐ যুগে এ গোটা এলাকারই সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল বাংলাদেশের তক্ষশীলা।

রশীদউদ্দীনও ভারতের ইতিহাস লিখেছেন, তার সঙ্গে তিনি বুদ্ধের জীবন আর শিক্ষা সম্বন্ধেও একটা অংশ জুড়ে দিয়েছেন যা লেখা হয়েছে যুগলভাবে আরবী আর পার্শীতে। অর্থাৎ গ্রন্থটির কোন কোন অধ্যায় লেখা হয়েছে আরবীতে আর কোন কোন অধ্যায় লেখা হয়েছে পার্শীতে। তাঁর এ গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন তিনি কমলশ্রী নামক এক কাশ্মীরী ভিক্ষুর কাছ থেকে। ভিক্ষু মুখে মুখে বলে গেছেন আর রশীদ

উদ্দীন তাকে দিয়াছেন ভাষা। অবশ্য ঐ ধরনের লেখা খুব প্রামাণ্য হওয়ার কথা নয়। তবুও যুগের কিছুটা পরিচয় এতে প্রতিফলিত না হয়ে পারে না। এদিক থেকেই বইটি মূল্যবান। গবেষকদের কাছে সে হিসাবে স্বীকৃত ও খুব সম্ভব রশীদ-উদ্দীন ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর লোক, কারণ বিশেষজ্ঞেরা তার পাণ্ডুলিপির কাল নির্ণয় করেছেন ১৩০২-১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দ আর হিজরি ৭০২ বলে। বুদ্ধের জন্ম আর জন্মান্তর সম্বন্ধে তাঁর বইতে বহু আজগুবী কথাই স্থান পেয়েছে—অবশ্য কমলশ্রীর মুখ থেকে শুনেই তিনি তা লিখেছেন। তার নিজের বিশ্বাস-অবিশ্বাস বা মতামত তিনি কোথাও প্রকাশ করেননি, খাটাননি কোথাও তার নিজের বিচার বুদ্ধি। জানাননি নিন্দা কিংবা প্রতিবাদ। কমলশ্রী এমন দাবিও করেছেন যে মঙ্গোলদের (মোগল নয়) শাসনকালে সারা তার্কেস্তান বৌদ্ধ ছিল—এমনকি ইসলামের আবির্ভাবের আগে মক্কা-মদীনায়ও নাকি বৌদ্ধ ধর্মই ছিল প্রচলিত, কাবা গৃহে যে ৩৬০টা মূর্তির কথা বলা হয় কমলশ্রীর মতে তা সবই বুদ্ধমূর্তি আর তখন ওখানে সে সবেরই হতো পূজা এমনি বহু রহস্যময় কথা উক্ত পাণ্ডুলিপিতে বর্ণিত হয়েছে যা অন্য কোন ইতিহাস গ্রন্থে দেখা যায় না। অন্য ধর্মের এক ভক্ত তার নিজ ধর্ম আর ধর্ম প্রবক্তাকে যে ভাবে দেখেন আর লেখকের সামনে যে ভাবে পরিবেশন করেছেন রশীদ-উদ্দীন হুবহু সে ভাবেই তা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনিও সে ধর্মকে সে ধর্ম বিশ্বাসীর চোখেই দেখেছেন আর তার পাঠকদের সামনে পরিবেশনও করেছেন ভাবে নিজের মনের রঙ কোথাও মেশাননি। এখানেই তার কৃতিত্ব। রশীদ উদ্দীনের এ পাণ্ডুলিপিটির বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন বিখ্যাত পণ্ডিত কার্লজন। (Karl John) [Central Asiatic Journal vol. II No. 2] সে যুগের আরব-পারস্য আর মধ্য এশিয়ার অনেক পণ্ডিত আর জ্ঞানসাধকই বিভিন্ন দেশের ইতিহাস ভূগোল চর্চা করেছেন, ধর্ম আর সংস্কৃতির খবরাখবর সংগ্রহ করেছেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে আর ঐ সম্বন্ধে প্রচুর মূল্যবান উপকরণ সংগ্রহ করে রেখে গেছেন ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য। ঐসব পণ্ডিত আর জ্ঞানসাধকদের অবদান সম্বন্ধে ডক্টর কার্ল জনের এ মন্তব্য স্মরণীয়।

The works of the Arabic and Persian historians and geographers are as is well known, very important sources of information on the history and culture of the Eurasian continent. This is especially true in the case of certain peoples of Central Eastern and Southern

Asia about whose existence in former times very few or no traces at all have been handed down. Were it not for the accounts given by Mohammadan writers we should be entirely ignorant of the past, the habits and customs of many of these nations.

জ্ঞানের বিচিত্র পথে বিচরণ ছাড়া কোন সভ্যতাই সম্পূর্ণতা পেতে পারে না। আরব আর পারশ্যের সম্মিলিত সাধনার যোগফলেরই নাম ইসলামী সভ্যতা। এ সভ্যতার মালমসলা জুগিয়েছেন জ্ঞানান্বেষীরাই। সেদিন মুসলিম জ্ঞানান্বেষীরা বিদ্যার ক্ষেত্রে কোন সীমা সরহদ মানেননি। মুসলিম অমুসলিম বিশ্বের তাবৎ বিদ্যা আর জ্ঞানকেই তাঁরা নিজেদের সাধনার বিষয় করে নিয়েছিলেন। জ্ঞানের প্রধান শর্ত কৌতূহল, জানার কৌতূহল, মন—মনীষীর স্বাভাবিক জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধান এই উত্তর সন্ধানের জন্যই আলবেরুনী ছুটে এসেছিলেন সুদূর ভারতে, অখণ্ড মনোযোগ আর কঠোর পরিশ্রমে শিখেছিলেন তিনি সংস্কৃত—পরিচিত হয়েছিলেন হিন্দু দর্শনের সাথে। বহু দুর্গম পথ অতিক্রম করেই এঁরা প্রবেশ করেছেন জ্ঞানের বিচিত্র রাজ্যে যার সঙ্গে তাঁদের নিজেদের ধর্ম আর জীবনাচরণের কোন সম্বন্ধই ছিল না। রশীদ উদ্দীনও এ পথের পথিক ছিলেন—তাই বুদ্ধের জীবন আর বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুর আশ্রয় নিতেও দ্বিধা করেননি। এমনকি বহু অবিশ্বাস্য কথাও তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন অন্যধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে তাঁর পাঠকদের কাছে তুলে ধরার জন্য। সেদিনের এসব মুসলিম জ্ঞানান্বেষীরা অন্য দেশ ধর্মের আলোচনার ব্যাপারেও নিজেদের মনের নিষ্ঠা, সততা আর নিরপেক্ষতা পুরোপুরি বজায় রেখেছিলেন। তাঁদের রচনায় নিন্দা বা প্রতিবাদের স্বর কখনো ফুটে ওঠেনি। আর তাঁরা দেখাননি কোথাও অসহিষ্ণুতার লক্ষণ। প্রকৃত আর সত্যিকার অর্থে জ্ঞানী আর পণ্ডিত হতে হলে কিছুটা দার্শনিক দৃষ্টি ভংগির অধিকারী হতে হয়—হয়তো এ দৃষ্টিভংগি তাঁদের জন্য ছিল সহজাত। এ প্রসঙ্গে দর্শন সম্বন্ধে এমিয়েলের (H.F. Amiel) এ সংজ্ঞা স্মরণীয় Philosophy means the complete liberty of the mind, and therefore independence of all social, political or religious prejudice (Journal-P195)

আল-বেরুনী, রশীদ উদ্দীন প্রভৃতি মুসলিম পণ্ডিত ও জ্ঞান সাধকদেরও এ দৃষ্টিভংগিই ছিল। তাঁরাও নিজেদের সব রকম সংস্কার ভুলে গিয়েই

জ্ঞানের পথে অগ্রসর হয়েছেন। এ কারণেই তাঁরা অন্য দেশের ইতিহাস, ভূগোল আর বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে সব উপকরণ রেখে গেছেন তৎপরবর্তী গবেষকদের কাছে এও মূল্যবান বিবেচিত হয়েছে। পাণ্ডিত্য আর জ্ঞান সাধনার জন্য মানসিক সততাও অত্যাবশ্যক—সেকালের মুসলিম সাধকদের তা ছিল আর তার পরিচয় তাঁরা রেখে গেছেন তাঁদের রচিত গ্রন্থাবলীতে। এমন কি পরবর্তী যুগে মোগল আমলেও এমন কিছু সংখ্যক মুসলিম জ্ঞান সাধকের আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁদের অবদান বিশেষ করে ধর্ম আর ইতিহাসের ক্ষেত্রে আজো স্মরণীয় হয়ে আছে। জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে এঁরা সার্বিক উদারতার যে উত্তরাধিকার রেখে গেছেন তা এযুগেও উত্তর-সূরীদের পথ দেখাতে সক্ষম। ইতিহাস আর ভূগোল এ দুই সব দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের এক বড় বুনিয়াদ—মুসলমান জ্ঞান সাধকেরা সে বুনিয়াদেরই সন্ধান করেছেন বেশী করে আর সে সন্ধান স্বদেশের সীমা ছাড়িয়ে দূর দূরান্তের বিদেশ বিভূঁই পর্যন্ত হয়েছিল প্রসারিত। আল-বেরুণী আর রশীদ উদ্দীন সে যুগে মুসলিম অনুসন্ধিৎসার দুই প্রতিভূ।

ঢেঁকি

ঢেঁকি খাঁটি দেশজ শব্দ। বস্তুটাও আগাগোড়া দেশী। বিদেশী উপকরণের কোন স্পর্শ লাগেনি তার গায়ে। তার কাজ-কারবারও দেশী জিনিস তথা দেশের মাটিতে উৎপন্ন নিয়েই। আজ এ খাঁটি দেশজ বস্তুটাও দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হওয়ার উপক্রম। ঢেঁকির সঙ্গে দেশের অর্থনীতির একটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল—বহু বিধবা আর অসহায় নারীর জীবিকা নির্ভর করতো এ ঢেঁকির উপর। ঢেঁকি উঠে যাওয়ার ফলে এসব মেয়েদের জীবনে নেমে এসেছে দারুণ আর্থিক সংকট। আজ তারা বেকার—বিকল্প অন্য কোন পেশার দুয়ার খুলে যায়নি এদের সামনে। ফলে আগের তুলনায় ভিখিরীর সংখ্যা দেশে অনেকগুণ এখন বেড়ে গেছে। তার মানে বহু মেয়ে বঞ্চিত হয়েছে আত্মমর্যাদার জীবন থেকে। জীবিকার জন্য, এদেশে জীবিকা মানে ত দু'মুঠো অন্ন—তার জন্য দুয়ারে দুয়ারে হাত পেতে বেড়ানোর মতো গ্লানিকর জীবন আর হতে পারে না। ঢেঁকি উঠে যাওয়ার ফলে এ গ্লানিকর জীবনই হয়েছে বহু অসহায় নিরলম্ব মেয়ের বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। দু'তিনটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়েছে, এমন বহু মেয়েকে স্রেফ বাড়ী বাড়ী ধান ভেনে নিজেকে সসম্মানে বাঁচিয়ে রাখতে আর ছেলে-মেয়েদের বড় করে তুলতে দেখেছি। এ করে কেউ কেউ ছেলেদের লেখা-পড়ার খরচও যে বহন করেছে, তার দৃষ্টান্তও এককালে বিরল ছিল না দেশে। ঢেঁকির সঙ্গে শুধু যে দু'বেলার অন্নের সম্পর্ক ছিল তা নয়, সম্পর্ক ছিল পিঠা-পুলির, সম্পর্ক ছিল মেয়েলি আনন্দ-উল্লাসের। ঢেঁকিশালে শুধু ঢেঁকির আওয়াজ শোনা যেত না, শোনা যেত মেয়েদের কলকণ্ঠও। মেয়েলি কণ্ঠের বাঁধ-ভাঙ্গা হাস্য-কলরবে তা থাকতো সব সময় মুখরিত। মেয়েদের, বিশেষ করে খেটে খাওয়া নিম্নবিত্তের মেয়েদের বে-পরওয়া আড্ডা ঢেঁকি-শালের মতো অন্য কোথাও জমতো না। এখানে মেয়েরা অসংকোচে

খুলে দিতো নিজেকে, ছড়িয়ে দিতো চাপা আবেগ অনুভূতিকে। বাড়ীতে জামাই কিংবা মেয়ে 'নায়র' এলে রাত-দুপুরেও ঢেঁকির আওয়াজকে চাপিয়ে মেয়েলি-কণ্ঠের কল-গুঞ্জনে ঢেঁকিশালা হয়ে উঠতো মুখরিত। এককালে ঢেঁকি শুধু যে মানুষের রসনাতৃপ্তি আর জঠরজ্বালা নিবারণের মাধ্যমে ছিল তা নয়—পল্লী-বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনেরও ছিল এক অপরিহার্য অঙ্গ। এভাবে বাংলাদেশের অন্দরমহলকে কেন্দ্র করে সংস্কৃতির যে রূপায়ণ ঘটেছে তাও কম বিচিত্র নয়। বিয়ে ইত্যাদি উৎসবের দিনে মেয়েরা এককালে বহু রকমের মেয়েলিগান করতো, কোন কোন অঞ্চলে এখনো করে থাকে, যার অধিকাংশই মেয়েদের রচনা, তার সঙ্গে নৃত্যেরও সহযোগ ছিল। বলা বাহুল্য, এর অধিকাংশেরই উৎস ঢেঁকিশালা।

ঢেঁকিরও একটা নিজস্ব তাল আছে, আছে নাচের ভংগী। ঢেঁকির উত্থান-পতনের তালে তালে মেয়েদের দেহও হয়ে উঠে নৃত্যশীল। তখন স্বভাবতঃই গলায় এসে যায় গান। আমাদের অঞ্চলে একদা ঢেঁকির পতনের তালে তালে মেয়েরা যে গান গাইত, তা এখানে উদ্ধৃত হলো। আমার বিশ্বাস, এ গানের উৎস ঢেঁকিশালা আর এ মেয়েদেরই রচনা।

বারা বান্ধ ধমকে পলদ দিয়া। (ধুয়া)
আজ কামিনীর গায়ে নাই সুখ
থাকদে মাগীর গায়ের ঘাম খুইলাম—
বারা বান্ধ ধমকে পলদ দিয়া।
(ও তার) মারে মা, বাপরে বাপ্
কিয়ারে বাপ,—মোর স্বামী রসিক বাপ্
(ঠান ঠমকির বিয়ার) বারা বান্ধ ধমকে পলদ দিয়া।
(হায়রে) আজ কামিনীর গায়ে নাই সুখ।
ঢেঁকি ভাইয়া উঠি বলে আমি বনের হাতি
সুন্দরী-এ বান্ধে বারা মোরে মারে লাথি
বারা বান্ধ ধমকে পলদ দিয়া।
হায়রে··· ··· ··· ··· ···।
কিলা ভাই-এ উঠি বলে আমরা দুইজন মিত
সুন্দরী-এ বান্ধে বারা আমরা গাই গীত—
বারা বান্ধ ধমকে পলদ দিয়া।

হায়রে··· ··· ··· ··· ···।
নাচনিয়ে উঠি বলে আমি বিধত গাছ
সুন্দরী-এ বান্ধে বারা আমি করি নাচ।
বারা বান্ধ ধমকে পলদ দিয়া।
হায়রে··· ··· ··· ··· ···।
প'ল ভাই-এ উঠি বলে কার ধার ধারি
সুন্দরী-এ বান্ধে বারা বুকের দরদে মরি—
বারা বান্ধ ধমকে পলদ দিয়া।
হায়রে··· ··· ··· ··· ··।
কুলা ভাই-এ উঠি বলে আমার পিছের মাথায় গুঁজ
সুন্দরী-এ বান্ধে বারা আমি উড়াই তুঁষ্
বারা বান্ধ ধমকে পলদ দিয়া।
হায়রে··· ··· ··· ··· ···।
ঝাড়ু ভাই-এ উঠি বলে আমার পিছের মাথায় ধান
সুন্দরী-এ বান্ধে বারা আমি কুড়াই ধান
বারা বান্ধ ধমকে পলদ দিয়া।
হায়রে··· ··· ··· ··· ···।
চালনী-এ উঠি বলে আমার ছিদ্র গুঁড়া গুঁড়া
সুন্দরী-এ বান্ধে বারা আমি উড়াই কুঁড়া।
বারা বান্ধ ধমকে পলদ দিয়া ॥

বারা বান্ধা মানে ধান বানা। পলদ দেওয়া মানে ঢেঁকির লেজের স্থানে গায়ের জোরে চাপ দিয়ে ঢেঁকির উত্থান-পতন সাধন। জ্ঞানেন্দ্র মোহন দত্ত তাঁর সুবিখ্যাত অধুনা দুষ্প্রাপ্য দু'খণ্ডে সমাপ্ত 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে' ঢেঁকির পরিচয় দিয়েছেন এভাবে: "ঢেঁকি—লম্বা, স্থূল ও গুরুভার কাষ্ঠ, সাধারণতঃ চারি হাত হতে সাত হাত। যেদিকে মুষলযুক্ত এবং উঠে পড়ে তা মাথার দিক। মুষলযুক্ত দিক মাথা। আঁকশলী পর্যন্ত পিঠ। আঁকশলীর স্থান পেট। বাকি অংশ লেজ। আঁকশলী—ঢেঁকির প্রায় তিন ভাগ ছাড়িয়া পশ্চাতের অঙ্গ ভেদ করিয়া যে শলাকা দুই পাশের অবলম্বনকাষ্ঠে সংলগ্ন থাকিয়া ঢেঁকির উঠা-পড়া সহজ করে। গড়—ঢেঁকির মুষল যে গর্তে পতিত হয়। (উদ্ধৃত গানে যাকে পল বলা হয়েছে) গড়কাঠ—গর্তের তলায় যে কাষ্ঠখণ্ড (স্থলবিশেষে পাথর) বসান থাকে।

পোয়া—হাড়িকাঠের মত যে কাঠ মাটিতে পোতা থাকে এবং যার দুই বাহুর ছিদ্রমধ্যে ঢেঁকির আঁকশলী প্রবিষ্ট থাকে (উদ্ধৃত গানে যাকে 'কিলা' বলা হয়েছে)। মোনা—ঢেঁকির মাথা বা সম্মুখপ্রান্তে সংলগ্ন মুষল। শামা—মুষলের মুখের লোহার বেড়।" বর্তমানে ঢেঁকির সঙ্গে আমাদের পরিচয় স্মৃতি থেকেও মুছে যাওয়ার উপক্রম। অথচ আমাদের ভাষা থেকে 'ঢেঁকি' শব্দ কখনো মুছে যাবে না; কারণ ইতিমধ্যে এর বহু অর্থব্যাপ্তি ঘটেছে এবং সে সঙ্গে তা ভাষা আর সাহিত্যেরও হয়ে পড়েছে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শহরে ছেলেরা কখনো হয়তো ঢেঁকি দেখেইনি। ঢেঁকির আভিধানিক পরিচয়টুকু তাদের হয়তো কাজে লাগবে, এ আশায় এখানে উদ্ধৃত হলো।

ঢেঁকির জন্ম কখন, ইতিহাসের কোন্ পর্বে তার আবির্ভাব, বিবর্তনের কোন্ স্তরে এসে মানুষ ঢেঁকি আবিষ্কার করেছে তা বলার উপায় নেই। অন্ততঃ আমার তা অজ্ঞাত। তবে তা যে বহু প্রাচীন যুগের ব্যাপার, তাতে সন্দেহ নেই। নারদ ত কিংবদন্তীর মানুষ বা রূপক—সে নারদের বাহন ছিল নাকি ঢেঁকি! ঢেঁকিতে চড়ে নারদ স্বর্গে গেছেন। কিন্তু স্বর্গের বাহন হলেও ঢেঁকির কিন্তু একই কাজ, তার কোন রকমফের নেই, ঘটেনি তার কর্তব্যে ইতরবিশেষ। তাই বলা হয়ে থাকে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও বারাই বাঁধে। ঢেঁকিকে অন্য কাজের উপযুক্ত মনে করাই হয় না। আবার ঢেঁকিকে মনে করা হয় আহাম্মকের প্রতীক—এ থেকে 'বুদ্ধির ঢেঁকি' কথাটার উৎপত্তি। ঢেঁকির নিজস্ব কোন ব্যক্তিত্বই নেই, নেই নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা—তাকে নাচালেই সে নাচে অর্থাৎ উঠে-পড়ে। তাই ব্যক্তিত্বহীনের পরিচয় দাঁড়িয়েছে 'আস্ত এক ঢেঁকি'। ঢেঁকিকে নিয়ে জেলায় জেলায় প্রচণ্ড প্রবচন রচিত হয়েছে।

যেমন:

অবুঝে বোঝাব কত বুঝ নাহি মানে।
ঢেঁকিরে বোঝাব কত নিত্য ধান ভানে।।

'অনুরোধে ঢেঁকি গেলা।' নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে হলে এ আমরা হরহামেশাই ব্যবহার করে থাকি। ঢেঁকি নিয়ে ধাঁধাঁও রচিত হয়েছে। যেমন:

'ইলৎ লুডে বিলৎ লুডে
লেংৎ ধইন্যে ফালদি উডে।' এর অর্থ কি?
এর অর্থ ঢেঁকি।

আর একটা চলতি প্রচলন হলো: যার বাপকে কুমীরে খেয়েছে সে ঢেঁকি দেখলেই ভয় পায়।

এখানে ঢেঁকিকে কুমীরের সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য এ উপমা বাহ্যিক সাদৃশ্যের জন্যই।

মানুষের রসবোধ ভারি অদ্ভুত। তার পরম উপকারীকে নিয়েও রসিকতা না করে সে ছাড়ে না। একদিন ঢেঁকি ছাড়া একদিনও চলতো না বাঙালীর। ঢেঁকির কোন একটা অঙ্গ বিকল হলেই হাঁড়ি চড়তো না ঘরে, দেখা দিত চাল-বাড়ন্ত। মানুষের এও আর এক রসিকতা, বাড়ন্ত মানে বাড়া, বৃদ্ধি পাওয়া অর্থাৎ প্রাচুর্য। মানুষ কিনা এখন তার মানে করে নিয়েছে শূন্যতা। চাল-বাড়ন্ত বললে এখন বুঝতে হবে, ঘরে চাল নেই।

আমরা ঢেঁকি-যুগের মানুষ। আমাদের বাল্যকালের অনেক অবসর মুহূর্ত ঢেঁকির পিঠেই কেটেছে। ঢেঁকির পিঠে সওয়ার হয়ে তখন কত পংক্ষীরাজই না আমরা ছুটিয়েছি, করেছি হাজারো স্বপ্নের ভাঙ্গা-গড়া। অনেক বাড়ীতে রান্নাঘরেই বসানো হত ঢেঁকি। আমাদেরও তাই ছিল। রান্না যাই হোক ঢেঁকির পিঠে চড়েই ঘ্রাণে অর্ধভোজন সেরে নিতাম আমরা খেতে যাওয়ার অনেক আগে। যেদিন পিঠা-পুলি হতো, সেদিন সর্বংসহা ঢেঁকির পিঠই হতো আমাদের সারাদিনের আসন।

একদিন কত ভালোবাসতাম এ ঢেঁকিকে, কত প্রিয় ছিল এ ঢেঁকির পিঠ। কোন কুশন চেয়ারে তেমন আরাম পাইনি কোনদিন। তাতে বসা এবং ঘোড়ায় চড়া একই সঙ্গে চলতো। এমন আসন বা বাহন যে নারদমুনির'ও প্রিয় হবে তা সহজে অনুমান করা যায়। কারণ মনে হয় নারদমুনিও অত্যন্ত ভোজন-রসিক ছিলেন। বলা বাহুল্য ঐ ঢেঁকি ছাড়া রসনা-তৃপ্তি সম্ভব ছিল না। তাই নারদ ঢেঁকি ছেড়ে স্বর্গে যেতেও রাজি হননি, আর সেখানে নিয়ে গিয়ে বারাই বাঁধাবেন তিনি ওকে দিয়ে। আশ্চর্য, তার থেকে সব রকম সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিয়ে মানুষ সে ঢেঁকিকে কিনা বানিয়েছে সব রকম নির্বুদ্ধিতার প্রতীক। আমাদের মুখে, আমাদের ভাষা আর সাহিত্যে সে আজ বোকা আর চরম আহাম্মকের প্রতিশব্দ। জানি না, আমাদের গবেষকদের কেউ বাংলাদেশের আর বাঙালী সংস্কৃতির ঢেঁকি-যুগের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করবেন কিনা। করলে ঢেঁকির যথার্থ অবদান যে শুধু নির্ণীত হবে তা নয়, তাঁরাও নির্ঘাত পেয়ে যাবেন ডক্টরেট। যার বাজারমূল্য সর্বজনবিদিত এবং সব বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীকৃত।

বিজয়ের পরবর্তী ভূমিকা ও তার দর্শন

বিজয়—কোন রাজনৈতিক দলেরই একমাত্র আদর্শ ও লক্ষ্য হতে পারে না, যেমন পাস বা ডিগ্রিলাভ হতে পারে না লেখা-পড়া বা শিক্ষাজীবনের একমাত্র লক্ষ্য বা আদর্শ। শিক্ষা বা ছাত্রজীবন বৃহত্তর জীবনেরই প্রস্তুতিপর্ব—দেহে মনে-চরিত্রে গড়ে ওঠারই এই কাল। লেখা-পড়া ব্যক্তির সার্বিক বিকাশের পথ। উপায়, সুযোগ আর দিশারী। তেমন রাজনীতি ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক দল তার মঞ্চ, তার সংগঠন ও কর্মচারী রাজনীতির এক বৃহত্তর পাঠশালা—নির্বাচন ও নির্বাচনী কর্মতৎপরতা একটি প্রস্তুতি-পর্ব মাত্র। নির্বাচনে জয় একটি পথ একটি সুযোগ ও একটি দিশারী। এ পথ ব্যক্তিস্বার্থের নয় সমষ্টির কল্যাণ সাধনের, এ সুযোগ দলীয় স্বার্থের নয় সমৃদ্ধতর সমাজ গঠনের এ দিশারী দলমত নির্বিশেষে সার্বজনীন দৃষ্টিভংগির।

দেশ, সমাজ ও জাতি দলের উর্ধ্বে—বিজয়ী আর বিজিত সব দলের এ দৃষ্টিভংগি হওয়া চাই। বিশেষ করে বিজয়ী দলের। বিজয়ী দল এখন দেশ আর জাতির প্রতিনিধি, মুখপাত্র এবং ভালো-মন্দের জন্য দায়ীও। বিজয়ী দলকে হতে হয় সর্বতোভাবে দায়িত্বশীল। দায়িত্বের বেলায় অতিমাত্রায় আবেগী হলে চলে না, হতে হয় যুক্তিনির্ভর ন্যায়শীল, উদার ও মানবিক। এবারকার নির্বাচনের ফলে আওয়ামী লীগ আর আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের ঘাড়ে এ দায়িত্ব এসে পড়েছে। এ এক বিরাট দায়িত্ব, ততোধিক বিরাট এক চ্যালেঞ্জও। এ দায়িত্ব ও চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা তারা অর্থাৎ আওয়ামী লীগকর্মী আর নেতারা করতে পারবেন কি? সারা দেশের এ এক বিরাট জিজ্ঞাসা।

আওয়ামী লীগ মোটামুটি তরুণদেরই পার্টি, তার নেতৃত্ব অপেক্ষাকৃত তরুণদেরই হাতে। দেশ এ তারুণ্যের সপক্ষেই রায় দিয়েছেন আর এ রায় নিঃসন্দেহে দ্বিধাহীন আর এক রকম স্বতঃস্ফূর্ত। পাকিস্তানের পূর্ব

ও পশ্চিমের মধ্যে বৈষম্যের যেমন অন্ত নেই, তেমনি অন্ত নেই বিরোধ আর বিরুদ্ধতারও। জীবনাচার আর দৃষ্টিভংগির পার্থক্য প্রায় আসমান-জমিন। তবুও উভয় অঞ্চলের আয় প্রায় একই অর্থাৎ তারুণ্যের সপক্ষে। সত্যই এ এক আশ্চর্য অঘটন। প্রবীণ নেতৃত্ব অতীতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে —এ ব্যর্থতারই ফলশ্রুতি এবারকার নির্বাচনী ফলাফল।

বিজয়ের দর্শন সংকীর্ণতা নয় উদারতা, ব্যক্তি বা দল নয় সার্বজনীনতা, স্বার্থপরতা নয় নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতা, ঔদ্ধত্য বা দাম্ভিকতা নয়, বিনয় ও শোভনতা। এবারকার নির্বাচনে বিজয়ী আমাদের তরুণদেরও এ হোক আদর্শ আর কর্মক্ষেত্রে এ হোক ভূমিকা। রাষ্ট্রের প্রধানতম বুনিয়াদ অর্থনীতি আর অর্থনীতিই প্রতিফলিত হয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে। এ তিন একসূত্রে গাঁথা। রাজনৈতিক ক্ষমতা যদি অর্থনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে হাত না মেলায়, তা হলে তা অর্থহীন হয়ে পড়ে—এ অর্থহীনতার নজির গত তেইশ বছর ধরে আমরা দেখেছি—তার তিক্ত অভিজ্ঞতা সাধারণ মানুষের মর্মে মর্মে বিঁধে রয়েছে। বলা বাহুল্য, এ সাধারণ মানুষেরাই এবার ভোটে ওলটপালট ঘটিয়েছে। বিজয়ের শিরোপা তারাই তুলে দিয়েছে তরুণ আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের মাথায়। কাজেই সর্বাগ্রে আওয়ামী লীগকে এদের স্বার্থের প্রতিই দিতে হবে নজর, পালন করতে হবে এদের প্রতি দায়িত্ব। অর্থনৈতিক ব্যবধানই সব ব্যবধানের মূল ও গোড়া। এ গোড়ায় হাত দিতে হবে, এখানে ঘটাতে হবে রদবদল। আজ এমন এক অর্থনৈতিক রূপরেখা চাই—যা প্রতি নাগরিককে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দেবে, বৈষম্যের ঘটাবে অবসান, পুরোপুরি অবসান ঘটাতে না পারলেও অন্ততঃ দূরত্বটা আনবে কমিয়ে। আজকের দিনে বিপ্লব মানে অর্থনৈতিক বিপ্লব—এ বিপ্লব ছাড়া অন্য বিপ্লব স্রেফ স্বেচ্ছাচারিতা, ক্ষমতার অপব্যবহার।

'সর্বাধিক জনসংখ্যার অধিকতম উপকার সাধন' অর্থাৎ greatest good to the greatest number—এ হচ্ছে রাজনৈতিক দর্শনের চরম কথা। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে এর চেয়ে উত্তম দর্শন আজো আবিষ্কৃত হতে বাকী। আমাদের বিজয়ী রাজনৈতিক দলকেও এ দর্শনেরই করতে হবে অনুসরণ। পরিকল্পনা নিতে হবে সর্বাধিক মানুষের কল্যাণ সাধনের। আর সে কল্যাণ আসবে অর্থনীতির পথেই—সে পথ সুস্থ, সুষ্ঠু আর বাস্তব হওয়া চাই। গত তেইশ বছর ধরে আমরা অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের স্রেফ হাওয়াই পরিকল্পনার কথাই কানে শুনেছি। বাস্তবায়নের কোন

চেষ্টাই হয়নি। আওয়ামী লীগ এখন যে সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছে, ইচ্ছা করলে বৈষম্যের অবসান তারা ঘটাতে পারবে। তবে চাই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা আর বাস্তবভিত্তিক প্ল্যান বা পরিকল্পনা। সমাজতান্ত্রিক দেশের আদর্শ ত চোখের সামনেই রয়েছে। স্রেফ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দ্বারা ওরা কি অসাধ্য সাধনই না করেছে! অর্থনৈতিক বৈষম্য আজ সেখানে চিরতরে বিলুপ্ত—ফলে সামাজিক আর সাংস্কৃতিক বৈষম্যেরও ঘটেছে অবসান। নেই অশিক্ষা কি নিরক্ষরতা ওখানে, নেই মনুষ্যত্বের চরম অপমান ভিক্ষুক কিম্বা দেহপসারিণী। মানব মর্যাদায় সবাই সমান—ওখানে শিক্ষার দরজা যেমন সমাজের সর্ব স্তরের মানুষের জন্য রয়েছে খোলা, তেমনি সমাধান করা হয়েছে সব রকম বেকারিদেরও। আমাদের সামনে আজ এসব সমস্যা মুখব্যাদান করে আছে। বিজয়ী আওয়ামী লীগকে এসব সমস্যা সমাধানে আসতে হবে এগিয়ে। দেশের তথা মানুষের মঙ্গলকামী রাজনৈতিক দলের কোনরকম গোড়ামি ও সংকীর্ণতা থাকা উচিত নয়। দেশের মানুষের জন্য যা কিছু হিতকর, তা যে দেশেরই প্রকরণপদ্ধতি হোক না, তা গ্রহণ করা উচিত। শুধু নীতিবিরুদ্ধ না হলেই হলো। অর্থনৈতিক পদ্ধতি কারো ধর্ম বা ধর্মবিশ্বাস হরণ করে নিতে পাবে না, যদি তা হয় আন্তরিক আর দৃঢ় প্রত্যয়ী।

পৃথিবীব্যাপী মুসলমানের অনগ্রগতির মূল কারণ অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা। একমাত্র অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আর নিরাপত্তা থাকলেই যথাযোগ্য শিক্ষা গ্রহণ সহজ আর সম্ভব হয় আর তখনই সম্ভব সংস্কৃতি চর্চা আর সংস্কৃতির মূল্যায়ন। ব্যতিক্রম সামাজিক অগ্রগতির মানদণ্ড নয়। সামাজিক অগ্রগতির মানদণ্ড গড় বা এভারেজ। এখানে আমাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়—আমাদের গড়পড়তা আয় যেমন নিম্নতম স্তরে, তেমনি শিক্ষা, সংস্কৃতি আর সামাজিক অবস্থায়ও সেই একই দশা। রাজনীতি তথা রাজনৈতিক ক্ষমতা আজ সর্বনিয়ামক—সে রাজনীতি আমাদের বেলায়, গত বারো বছর ধরে আমাদের রাজনৈতিক জীবন ছিল বন্ধ্যা। বলতে গেলে স্বাধীন রাজনীতির কোন অস্তিত্বই ছিল না এ এক যুগ ধরে। এবার সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃতি পাওয়ার পর স্বাধীন রাজনীতির শুভ সূচনা। আওয়ামী লীগ এ শুভ সূচনার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করে নির্বাচনে জয়ী হয়েছে। এ জয়কে সারা দেশের জন্য সার্থক করে তোলার দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানের যেমন তেমনি নির্বাচনে বিজয়ীদেরও। তাঁরা যদি 'ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠতে না পারেন, তাহলে অচিরেই প্রতিষ্ঠানে ফাটল ধরবে, দলে দেখা

দেবে অনৈক্য। তখন আজকের বিজয় অগোণে পর্যবসিত হবে পরাজয়ের দুঃসহ গ্লানিতে। 'জয় বাংলা' যেন 'জয় আমি' জয় তুমিতে পরিণত না হয়। 'জয় বাংলা' পূর্ব বাংলার সব মানুষের জয়, সব মানুষের শুভ আর সমৃদ্ধি—সব বাঙালীর মর্যাদা বৃদ্ধিরই বার্তাবহ। তার মানে অ-বাঙালীর অমর্যাদা করা নয়—তাদের মানব-মর্যাদাকেও দিতে হবে স্বীকৃতি। তারা বাংলা ভাষাভাষী না হলেও তারাও এদেশের নাগরিক, কালক্রমে প্রাকৃতিক নিয়মে তারাও আমাদের সঙ্গে 'এক দেহে' লীন না হয়ে পারে না। আমাদের জাতীয় সত্তার তারাও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

আজ দেশের অধিকাংশ 'সম্পদ বাইশ পরিবারের' কুক্ষিগত—এ অভিযোগ অর্থহীন এ কারণে যে, দেশে এখন যে পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থা চালু রয়েছে, এঁরা তারই ফসল, বিষফলও বলা যায়। কাজেই অর্থনীতির ক্ষেত্রে কোন সামগ্রিক পরিবর্তন না ঘটানো হলে 'বাইশ পরিবার' কালক্রমে হয়তো চুয়াল্লিশ পরিবারে গিয়ে দাঁড়াবে, এবং এর অর্ধেক যদি পূর্ব বাংলার অধিবাসীও হয়, তাহলেও জনগণের কিছুমাত্র অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে না। কাজেই দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে এতকাল যে ভ্রান্তনীতি অনুসরণ করে আসা হয়েছে, তার আমূল পরিবর্তন ছাড়া দেশের আর দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণ নেই। এখনই সেদিকেই নিয়োগ করতে হবে সব শক্তি। 'জয়বাংলা' এক বিদ্যুৎ-গর্ভ স্লোগান, এ স্লোগানে জন-চিত্ত উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে, আশা-উন্মেদে হয়ে উঠেছে উদ্দীপিত। এ স্লোগান আওয়ামী লীগের আবিষ্কার, আওয়ামী লীগের অবদান, আওয়ামী লীগ এর উদ্‌গাতা। এ স্লোগানের যা তাৎপর্য ও মর্মবাণী, তাকে জনগণের জীবনে অর্থপূর্ণ করে তোলা তাই বিজয়ী আওয়ামী লীগেরই দায়িত্ব। নিরন্নের অন্নের, বস্ত্রহীনের বস্ত্রের, অশিক্ষিতের জন্য শিক্ষার, রুগ্নের জন্য চিকিৎসার আর বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না হলে অচিরে এ বিদ্যুৎগর্ভ স্লোগান ও সব আবেদন হারিয়ে স্রেফ প্রহসনে পরিণত হবে। অতীতে 'বন্দেমাতরম', 'আল্লাহু আকবর', 'ইনকেলাব জিন্দাবাদ', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ইত্যাদি বহুতর স্লোগান জনগণের শোনা আছে, বড় আশায় ঐ-সব স্লোগান 'বজ্রকণ্ঠে' তারাও আওড়িয়েছে—ঐসব স্লোগানও সেদিন কম বিদ্যুৎ-গর্ভ ছিল না। কিন্তু জনগণ যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে গেছে আজো—ওদের জীবনে ঐ সব স্লোগান মোটেও অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। কার্যসিদ্ধির পর দু'দিনেই তা স্রেফ জনগণের জীবনে পরিণত হয়েছে প্রচণ্ড এক প্রহসনে। 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে গগন-পবন মুখরিত করে তোলা হয়েছে বছরের পর

বছর ধরে। কিন্তু পরিণামে 'আকবর' হয়েছে 'বাইশ পরিবার' আর কয়েকজন ক্ষমতাসীন হোমরা-চোমরা মাত্র।' পাকিস্তান জিন্দাবাদ' কথাটাও অর্থপূর্ণ হয়েছে স্রেফ মুষ্টিমেয়ের জীবনেই—যে জনগণের ভোটে পাকিস্তান হয়েছে অর্জিত, তাদের 'জিন্দা' করা আর 'জিন্দা' রাখার কোন ব্যবস্থাই এ যাবত গ্রহণ করা হয়নি। এভাবে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগানকেও এক নিদারুণ প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে মাত্রকয়েক বছরের মধ্যেই। ফলে ঐ ধ্বনি শুনে এখন আর কারো মন চকিত হয়ে ওঠে না, হয়ে ওঠে না কারো গলা সোচ্চার। বিজয়ী দল গোড়া থেকেই যদি জনগণের অর্থনৈতিক জীবন-মানের উন্নয়নের বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাকে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ না করে, তাহলে অচিরে 'জয় বাংলা' স্লোগানও যে আবেদন হারিয়ে স্রেফ এক হাওয়াই বুলিতে পরিণত হবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। 'জয় বাংলা' মানে বাঙালীর সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন—অভাবমুক্ত নিরাপদ জীবন, দৈহিক ও মানবিক বৃত্তি ও শক্তির পূর্ণ বিকাশের সুযোগ সুবিধা। 'জয় বাংলা' মানে পূর্ব বাংলার, যাকে এখন বাংলাদেশ বলে অভিহিত করা হচ্ছে, তার ভৌগোলিক সীমায় বসবাসকারী সব মানুষের জন্য সুখী জীবন—জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষা ও নর-নারী নির্বিশেষে সব মানুষের অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থা, সকলের জন্য শিক্ষা আর চিকিৎসাকে সহজলভ্য করা, মাথা গোঁজার ঠাই করে সামগ্রিকভাবে জীবনের বিকাশ আর সম্প্রসারণের অনুকূল পরিবেশ ও ক্ষেত্র তৈরি করা। বলা বাহুল্য, এসব ছাড়া 'জয়বাংলা' কথাটি অর্থহীন। জীবিকার নিরাপত্তা, সামাজিক আর সাংস্কৃতিক জীবনের প্রথম ও প্রধানশর্ত—এছাড়া ধর্ম-কর্ম, পাপ পুণ্য সবই ব্যর্থ। ভুখা-নাঙ্গা মানুষকে ধর্মের কথা শোনাতে যাওয়ার মতো অমানুষিকতা কল্পনা করা যায় না। শুধু অমানুষিকতা নয়, এ করা মানে ধর্মকেও আর একটা অবাস্তব স্লোগানে পরিণত করে প্রহসনের বস্তু করে তোলা।

এ প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর এ সুবিখ্যাত কথাগুলি স্মরণীয়: "When all about me are dying for want of food, the only occupation permissible for me is to feed the hungry. To a people famishing and idle the only acceptable form in which God can dare to appear is in work, and promise of food as wages" আমার বিশ্বাস বিজয়ী আওয়ামী লীগেরও আজ এ ভূমিকা: নিরন্নের জন্য অন্নের আর বেকারের জন্য কর্মের সংস্থান

করা। দেশের বর্তমান অবস্থায় এর চেয়ে মহত্তম দর্শন কল্পনা করা যায় না। ব্যক্তির যেমন, তেমনি দলেরও একটা ফিলসফী বা দর্শন চাই। আওয়ামী লীগ এ দর্শন গ্রহণ করলে দেশ উপকৃত হবে আর তাঁদের এ বিজয়ও হবে সার্থক। জীবনের কোন অংশই বিভক্ত বা খণ্ডিত নয়। সামাজিক বা সাংস্কৃতিক জীবন বলে আলাদা কিছু নেই। জীবিকার সঙ্গে সবকিছুই এক সূত্রে গাঁথা ও বাঁধা। জীবিকার ব্যবস্থা ছাড়া সামাজিক বা সাংস্কৃতিক জীবনের পরিকল্পনা চলে না। করতে গেলে ত হবে অবাস্তব ও ব্যর্থ। এ ব্যর্থতার নজির আমাদের গত তেইশ বছরের ইতিহাস। এ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে বিজয়ী আওয়ামী লীগের হাতে—এ আমাদের একমাত্র কাম্য।

'স্বতন্ত্র' বনাম দলীয় প্রার্থী

গণতান্ত্রিক রাজনীতি মানে দলীয় তথা দল-নির্ভর রাজনীতি। এ রাজনীতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় দীর্ঘদিনের। এর ভালোমন্দ সম্বন্ধে আমরা ওয়াকিফহাল। গণতান্ত্রিক তথা দলীয় রাজনীতিতে যথেষ্ট মন্দ দিক যে রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই—দলীয় স্বার্থের কাছে অনেক সময় বৃহত্তর স্বার্থকে এ রাজনীতিতে বিসর্জন দিতে হয়। অনেক সময় সৎ আর যোগ্য লোককে মনোনয়ন না দিয়ে দিতে হয় অপেক্ষাকৃত অযোগ্য বা অপরিচিত প্রার্থীকে। কারণ দলের নির্বাচনী সাফল্যের উপর দলের সার্বিক আর দলীয় কর্মসূচীর সাফল্য বাস্তবায়ন অনেকখানি নির্ভর করে। কাজেই দলীয় নেতারা প্রার্থীর নির্বাচনী সাফল্যের সম্ভাবনার উপর গুরুত্ব না দিয়ে পারে না। যে রাজনীতির সাফল্য সংখ্যা-প্রাধান্যের উপর নির্ভরশীল, সে রাজনীতির পক্ষে সব সময় ব্যক্তিগত প্রতিভা, যোগ্যতা, পাণ্ডিত্য এমনকি সততারও মূল্য দেওয়া সম্ভব হয় না। গণতান্ত্রিক রাজনীতির এ সীমাবদ্ধতা অনস্বীকার্য। অনেক সময় দলীয় সদস্যরাও এ সত্যটা উপলব্ধি করে না। ফলে তারা দল ছেড়ে যাওয়ার হুমকি দিয়ে থাকে, কেউ কেউ যায়ও দল ছেড়ে। আবার কেউ কেউ স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে নিজ দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেও দ্বিধা করে না। এতে বুঝতে পারা যায়, এরা দলের স্বার্থের চেয়েও নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থটাকেই বড় করে দেখেছে সব সময়—যা এতকাল মনের আড়ালে গোপন ছিল এখন স্বতন্ত্র-প্রার্থী হিসেবে তারই শুধু ঘটেছে বহিঃপ্রকাশ। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে দলীয় আনুগত্য অপরিহার্য—এ আনুগত্যের অভাব দেখা দিলে শুধু যে দলীয় সংহতি বিঘ্নিত হয় তা নয়, নির্বাচনী সাফল্যের পথেও তা হয়ে দাঁড়ায় প্রবল বাধা। বলা বাহুল্য, সব দলেরই লক্ষ্য নির্বাচনে সাফল্য অর্জন—এ সাফল্য ছাড়া দলীয় কর্মসূচী বাস্তবায়ন সম্ভব নয় কিছুতেই। গণতন্ত্রের পথে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা অর্জন নির্বাচনের মাধ্যমে দলীয়

সংখ্যাপ্রাধান্য লাভ না করে অন্যভাবে কিছুতেই সম্ভব নয়। আর যে যেভাবে সম্ভব তা গণতান্ত্রিক নয়। তার তিক্ত অভিজ্ঞতা আমরা দু'দুবারই পেয়েছি।

সে তিক্ত অভিজ্ঞতার হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে নির্বাচন আমাদের চাই, চাই দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচন। তেমন নির্বাচনে দলের সাফল্য ষোল আনা নির্ভর করে দলীয় আনুগত্যের উপর। আনুগত্য ভঙ্গকারীরা শুধু যে দলের শত্রু তা নয়, তারা গণতন্ত্রেরও শত্রু। কারণ গণতন্ত্র মানে দল—আর গণতন্ত্রের সাফল্য-অসাফল্য নির্ভর করে দলীয় আনুগত্যের উপর।

যত বড় বড় বুলিই আওড়ানো হোক না কেন, স্বতন্ত্র-প্রার্থী মানে একজন মানুষ, একজন ব্যক্তিমাত্র। যার নিজের প্রতি ছাড়া আর কারো প্রতি কোন আনুগত্য নেই—ব্যক্তিগত ছাড়া, যা সাধারণতঃ নিজের স্বার্থ-কেন্দ্রিকই হয়ে থাকে—অন্য কোন কর্মসূচীও নেই যার। থাকলেও একক ব্যক্তির পক্ষে তার বাস্তবায়ন কিছুতেই সম্ভব নয়। নির্বাচনের সময় স্বতন্ত্র প্রার্থীরা অনেক বড় বড় কথা বলে থাকে, ঘোষণা করে থাকে নানা দুঃসাহসিক কর্মসূচীও। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাজনীতির অ, আ'র সঙ্গেও যাদের পরিচয় আছে, তারা সহজে-বুঝতে পারে এ স্রেফ ভাঁওতাবাজি। গণতন্ত্রে একের তথা 'স্বতন্ত্রের' কোন মূল্য নেই। সংখ্যা অর্থাৎ সংখ্যা-প্রাধান্য গণতন্ত্রের প্রধান স্তম্ভ। এ সংখ্যা জোগাতে পারে দল-নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর সাফল্যই দিয়ে থাকে প্রয়োজনীয় সংখ্যা প্রধান্য। যার ফলে দলের পক্ষে সরকার গঠন, দলীয় কর্মসূচী বাস্তবায়ন ইত্যাদি লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়। তাই গণতান্ত্রিক নির্বাচনে স্বতন্ত্র-প্রার্থীর কোন মূল্য নেই—স্বতন্ত্র প্রার্থীকে ভোট দেওয়া মানে ভোটের অপচয় করা। দেশের বিধান পরিষদে অকারণে বিশৃংখলা ডেকে আনা। কারণ স্বতন্ত্র-সদস্যদের কোন রকম শাসন-শৃংখলা মেনে চলার দায় নেই। তারা নিজেদের খেয়াল-খুশিতেই চলবে, সেভাবেই দেবে ভোট। সে ভোট যে ব্যক্তিগত লাভা-লাভ হিসাব করেই দেওয়া হবে তাতেও বোধ করি সন্দেহ নেই। কারণ কারো কাছে তাদের কোন জবাবদিহির বালাই নেই। নির্বাচিত হওয়ার পর ভোটার বা নির্বাচকবওলীর কথা কেই বা মনে রাখে? মনে রাখার প্রয়োজনই বোধ করে না তখন কেউই। বিশেষতঃ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টরা এসব বিষয়ে পুরোপুরি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট। ইণ্ডিপেণ্ডেন্টেরই ত বাংলা প্রতিশব্দ 'স্বতন্ত্র'।

গণতন্ত্রে যারা বিশ্বাস করে তাদের পক্ষে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে অংশ নেয়ার কোন মানে হয় না। রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গ। দেখে অবাক হতে হয় মি: এ. কে. ব্রোহীর মতো গণতন্ত্রে বিশ্বাস আইনজ্ঞ ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আর বলছেন নির্বাচনে জেতার পর 'স্বতন্ত্ররা' মিলে তারাও আর একটি দল করবেন। কেন? দলটা এখন করতে আপত্তি কি? দল করলে দলের একটা গ্রহণযোগ্য কর্মসূচী চাই। সে কর্মসূচী তারা এখন ভোটারদের সামনে পেশ করতে বোধ করি রাজী নন্। করলে তা বাস্তবায়নের দায়দায়িত্বও সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়বে। যে দায়িত্ব নিতে তিনি আর তার 'সম-মনারা' বোধ করি প্রস্তুত নন্। তা না হলে তাঁরা এখন কেন দল গঠন করে দলীয় মেনিফেস্টোর ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন না? কাজেই এও আর একরকম গোজা মিল—নিজের মনকে যেমন, তেমনি ভোটারদেরও চোখঠারানো। এ কিছুতেই সুস্থ আর সৎ রাজনীতির লক্ষণ নয়। 'স্বতন্ত্রপ্রার্থী' মানে কোন রকমদলীয় শৃংখলা না মেনে ইচ্ছামতো, যত্রতত্র চরে বেড়ানো। গণতান্ত্রিক রাজনীতির জন্য এ অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাই আমি 'স্বতন্ত্র প্রার্থী' হওয়ার যেমন, তেমনি স্বতন্ত্র প্রার্থীকে ভোট দেওয়ারও বিরোধী।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পঞ্চাশৎ বার্ষিকী

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পঞ্চাশৎ বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। এ বিপ্লব রাশিয়ায় সংঘটিত হয়েছিল বটে কিন্তু এর লক্ষ্য আর তাৎপর্য, এর সত্য আর এর মর্মবাণী সারা দুনিয়ার জন্য—সারা মানব জাতির ভাগ্য এর সঙ্গে একই সুত্রে গাঁথা। তাই এ বিপ্লব সাড়া জাগিয়েছিল বিশ্বব্যাপী, দেশে দেশে নির্যাতিত সর্বহারা মানুষ এ বিপ্লবের সাফল্যে প্রথম দেখতে পেয়েছিল আশার দীপ-শিখা—খুঁজে পেয়েছিল তাদের মুক্তি-সনদ। অন্যদিকে পৃথিবীর পুঁজিপতি আর পুঁজিবাদী দেশগুলি ভয়ে আতঙ্কে কেঁপে উঠেছিল এর অভূতপূর্ব সাফল্য দেখে—এতযুগের কায়েমি স্বার্থ বুঝি তাদের এবার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। এ-দিন থেকে পৃথিবী ভাগ হয়ে গেল দুই স্বতন্ত্র শিবিরে—দুই সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী মতবাদে। এক শিবির বা মতবাদ প্রাচীন ঘুণে-ধরা গতানুগতিক সমাজব্যবস্থাকে কায়েমী করে রাখার জন্য মরীয়া হয়ে উঠল। অন্য শিবির সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার নেতৃত্বে সমানাধিকারের ভিত্তিতে, সব সম্পদকে ভাগ করে ভোগ করার নীতিতে মানবসমাজকে নতুন করে গড়ে তোলার দায়িত্ব তুলে নিলে কাঁধে। পুঁজিবাদের মতো সমাজতন্ত্র দেশগত, জাতিগত বা বর্ণগত নয়—তা সর্বতো-ভাবে বৈশ্বিক ও মানবিক। সমাজতন্ত্র মানবজাতির অখণ্ড সত্তায়, অখণ্ড রূপে আর সার্বিক কল্যাণে বিশ্বাসী। তার বিশ্বব্যাপী আবেদনও এ কারণে। মাত্র এ পঞ্চাশ বছরে সমাজতন্ত্র পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশী মানুষকে আজ নিজের পক্ষে নিয়ে আসতে পেরেছে—এও এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ইতিপূর্বে কোন বিপ্লব বা আন্দোলন এর সিকিপরিমাণ সাফল্যও অর্জন করেনি। সমাজতন্ত্রের গভীরে মহৎ ও চিরন্তন মানব-সত্য নিহিত না থাকলে এ অকল্পনীয় সাফল্য কিছুতেই সম্ভব হতো না।

যারা সমাজতান্ত্রিক দেশের মানুষ নয়, হয়তো পুরোপুরি বিশ্বাসীও নয়, সমাজতন্ত্রে তাদের মনও সমাজতন্ত্রের অন্তর্নিহিত সত্যে, তার মানবিক মূল্যবোধে আলোড়িত, এমন কি মুগ্ধ না হয়ে পারেনি ! এ মহান অক্টোবর বিপ্লব সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বিখ্যাত বৃটিশ লেখক মিঃ সি, পি, স্নো (Mr. C. P. Snow)লিখেছেন : ' There is, of course, no doubt that the October Revolution is the dominating event of the 20th Century. It has effected all our lives, whether we live in the Soviet Union or outside."

দীর্ঘদিনের ভারসাম্যহীন সমাজব্যবস্থা ও মাৎস্যন্যায় নীতির ফলে পৃথিবীব্যাপী এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল—যুগ-যুগান্তব ধরে পুরুষানুক্রমে সয়ে যেতে যেতে মানুষের মনে এ ধারণাই হয়তো বদ্ধমূল হয়েছিল যে, বড় মাছ ছোট মাছকে খেয়ে ফেলবে, বড় টাকা ছোট টাকাকে গিলে খাবে, সবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করবে, তার শ্রমের ফল কেড়ে নেবে, যার আছে তার আরো বাড়বে, যাব নেই সে আরো বেশী বঞ্চিত হবে—এ হচ্ছে ঐশী-বিধান, পৃথিবীর এ হচ্ছে স্বাভাবিক নিয়ম। অক্টোবর বিপ্লব যুগ-যুগান্তের এ ধারণাকেই ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে—সমূলে উৎপাটন করে দিয়েছে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া থেকে এ বিশ্বাস—মানবজাতির জন্য এ এক 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', মানুষের সুপ্ত শক্তির এ এক বিস্ময়কর জাগরণ। অক্টোবর বিপ্লবের প্রধানতম ফলশ্রুতি মানুষের এ মোহমুক্তি ও আত্ম-আবিষ্কার। সমাজ কিছুমাত্র ঐশী ব্যাপার নয়—সমাজব্যবস্থায় স্থান নেই কোনরকম অলৌকিকতার, এ এক স্বাভাবিক, মানবিক আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। সমাজ-ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিক সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে তাতে অব্যবস্থা আর অবিচার অনুপ্রবেশ না করে পারে না—সমাজতন্ত্রই এর একমাত্র প্রতিষেধক। কারণ সমাজতন্ত্রে অ-বিজ্ঞানের কোন স্থান নেই—স্থান নেই স্বপ্ন-কল্পনার ভুয়া আশ্বাস কিংবা প্রতিশ্রুতির। পারলৌকিক জীবন নিয়ে সমাজতন্ত্র মাথা ঘামায় না বলে কাকেও অপ্রমাণ্য আশ্বাসের মোহ-মরীচিকায় আচ্ছন্ন করে রাখার উপায় নেই তাতে ! ইহজীবনের, যে জীবন চাক্ষুষ, বাস্তব, ব্যবহারিক আর ধরা-ছোঁওয়ার বস্তু তার সমস্যা সমাধানই সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য ও আদর্শ। চক্ষুষ্মান লোককে ফাঁকি দেয়ার উপায় নেই এখানে—কারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ বেয়েই সমাজতন্ত্রের অভিযাত্রা। ভুল শোধরাতে সমাজতন্ত্রের কোন সংকোচ নেই—Trial & error এর এক অপরিহার্য পদ্ধতি, এ করেই সমাজতন্ত্র

দেশে দেশে এগিয়ে যাচ্ছে, আবর্তিত হচ্ছে ক্রমাগত, প্রয়োজনবোধে হচ্ছে রূপান্তরিত। মানুষের চাহিদা, প্রয়োজন আর আশা-অন্বেষার পরিপ্রেক্ষিতেই এ না হয়ে উপায় নেই। জীবনের সঙ্গে জীবনের, জীবনের সঙ্গে বহির্জগৎ আর অন্তর্জগতের সমঝোতা একমাত্র সমাজতন্ত্রেই সম্ভব—কারণ এখানে সব মানুষের শ্রম, শক্তি, যোগ্যতা আর প্রয়োজন সমভাবে স্বীকৃত। সমাজতন্ত্র মানুষের বাচার হাতিয়ার, বিকাশের ক্ষেত্র আর সমৃদ্ধির পথ। দৈহিক বা মানসিক সবরকম শ্রমই যাবতীয় সম্পদের গোড়া, সব কিছুরই মূলধন—এ পরম সত্যটি অক্টোবর বিপ্লবের পর সমাজতন্ত্র বিশ্বের জনগণের সামনে তুলে ধরেছে। মেহনতী মানুষের মেহনতেই সারা বিশ্ব গড়ে উঠেছে সত্য, কিন্তু সে মেহনতী মানুষ এতকাল হয়েছে উপেক্ষিত, অবহেলিত ও লাঞ্ছিত—অক্টোবর বিপ্লবে বিশ্বের মেহনতী মানুষ খুঁজে পেয়েছে তাদের মুক্তির পথ। তাদের যৌথ-শক্তির অসাধ্যসাধনপটিয়সী ক্ষমতার। এ ক্ষমতার জোরেই অর্ধেক পৃথিবী বদলে গেছে—দু'দিন আগে কি পরে বাকি পৃথিবীও না বদলে পারে না। সঠিক পথের সন্ধান পাওয়াই বড় কথা, সে পথ অক্টোবর বিপ্লব মানুষের সামনে খুলে দিয়েছে। নানা তুকতাক্ কথা দিয়ে বেশীদিন আর মানুষকে এমন মোহ-মুগ্ধ করে রাখা যাবে না। অক্টোবর বিপ্লবের পর মানুষের, বিশেষ করে মেহনতী মানুষের মন আর দৃষ্টিভংগী আমূল বদলে গেছে, বদলে যাচ্ছে—সে আজ স্বতন্ত্র মানুষ, সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে গড়ে উঠেছে। মনীষী রোমা রোঁলার মন্তব্য : "The Revolution's greatest work of art is the people it is creating.' রোঁলা নিজেও এক মহৎ শিল্পী। তাই এ নতুনভাবে গড়ে ওঠা মানুষের মধ্যে তিনি মহত্তম শিল্পকেই দেখতে পেয়েছেন। অক্টোবর বিপ্লব তথা সমাজতন্ত্রও মানুষকে এ মহৎ মর্যাদায় উন্নীত করেছে। সমাজতন্ত্রে কোন মানুষই হেয় বা হীন নয়, কেউ নয় অবহেলিত কি উপেক্ষিত। মানব-মর্যাদায় সবাই সমান। এ কারণেই শুধু সোভিয়েত নয়, রাশিয়ায় নয়, তাবৎ পৃথিবীতেই অক্টোবর বিপ্লব বার্ষিকী আজ মহাসমারোহে প্রতিপালিত হচ্ছে। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানও তারই অংশ—মনুষ্যত্বের সাথে বেচে থাকার অধিকার সব মানুষের সমান, অক্টোবর বিপ্লব সে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার স্মারক। আমাদের দেশেও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক—সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক ত্বরান্বিত। মানব-মর্যাদায় বিশ্বাসী মাত্রেরই আজ এ কামনা। সমাজতন্ত্র কেন? এ প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের জন্য ধনতন্ত্র আর সমাজতন্ত্রের কিছুটা তুলনামূলক

পরিচিতি অত্যাবশ্যক। এ প্রসঙ্গে ধনতন্ত্রের দেশ আমেরিকা আর সমাজ-তন্ত্রের দেশ সোভিয়েট ভ্রমণ করে এসে একজন বাঙালী লেখক যা লিখেছেন তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো :

"সোভিয়েত রাশিয়ায় সমষ্টিগত সহযোগিতাই বড় কথা। অবশ্য উৎপাদনের প্রতিযোগিতা রাশিয়ায়ও আছে—এক কারখানার সঙ্গে অন্য কারখানার কিংবা এক মজুরের সঙ্গে অন্য মজুরের। কিন্তু তার পেছনে অপরকে বঞ্চিত করে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত কোন মুনাফা অর্জনের তাগিদ নেই—সমাজের প্রয়োজনে সমষ্টিগত কল্যাণই সেখানে এ ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার একমাত্র উদ্দেশ্য। এর ফলে সোভিয়েত জন-জীবনে পারস্পরিক বিদ্বেষ, হিংসা, ঘৃণা ও বিরোধ এত কমে গেছে যে, খুনোখুনি, মারামারি, ফৌজদারী মামলা ইত্যাদি পৃথিবীর যে-কোন দেশের তুলনায় অতি সামান্য। অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং জীবনযাত্রার এত বেগতা, অস্থিরতা, অবিশ্বাস ও ঈর্ষা ডেকে এনেছে যে, খুন, জখম, ডাকাতি, গুণ্ডামি আর অপরাধ-প্রবণতা সমাজের চিন্তাশীল অংশকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

......সোভিয়েত সমাজে যার উপার্জন যত কম রাষ্ট্রের নিকট তার 'প্রিভিলেজ' তত বেশী। একটি অল্পবেতনের মজুরের ছেলে ইউনিভার্সিটি পর্যায় পর্যন্ত পড়বার যত আর্থিক আনুকূল্য গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে পায় একজন বড় ইঞ্জিনিয়ারের স্বচ্ছল অবস্থার ছেলে তত সুবিধা পায় না। অর্থাৎ সোভিয়েত সমাজে স্বল্পবেতনের লোকদের জন্য একটা সামাজিক গ্যারান্টি আছে যা মার্কিন সমাজে অনুপস্থিত।

আমেরিকায় অন্তত শতকরা বিশজন লোক গরীব বা বেকার আছে। সোভিয়েত সমাজে কেউ বেকার নেই—নিঃস্ব বা উপার্জনের উপায় নেই এমন দেখা যায় না। এখানে ভিক্ষুক আর বারাঙ্গনা যেমন নেই তেমনি নেই কোনরকম বর্ণ-বিদ্বেষও।

বহু ব্যাপারে রাশিয়া সংযত।...... যৌন-জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা ওখানে অত্যন্ত কম। 'নাইট-লাইফের' জৌলুস নেই, অর্ধ-নগ্ন নারী-দেহ বা নারী-চিত্র সেখানে কোথাও চোখে পড়ে না। আমেরিকায় অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। শ্রম-শিল্পায়নের সাথে সাথে সংস্কৃতিকে সমানভাবে এবং পাশাপাশি রক্ষা করার প্রভূত উদ্যম চলছে রাশিয়ায়। এটি সব চেয়ে বড় কথা। শোষণহীন সমাজ একমাত্র বড় কথা নয়। শোষণ

নেই, অথচ কালচার বা সংস্কৃতিও নেই তেমন সমাজ খুব কাম্য নয়, এভাবে সমাজতন্ত্র সার্থক হতে পারে না। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব এখানে এবং এদিক দিয়ে রাশিয়া আমেরিকাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে।" (বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় : বিংশ শতাব্দী : শারদীয়া সংখ্যা : ১৩৬৫)।

মোট কথা একটা সুস্থ নীতির উপর য নীতির সঙ্গে মানব-স্বভাবের সঙ্গতি রয়েছে—যদি সমাজকে দাড করাতে হয় তা'হলে সমাজতন্ত্র ছাড়া উপায় নেই। গোটা মানুষের তথা গোটা সমাজের বিকাশের জন্য সমাজতন্ত্র অপরিহার্য। অক্টোবর বিপ্লবের এ বাণী—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পঞ্চাশ বার্ষিকীতে তা নতুন করে স্মরণ করার প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে আমাদের মতো অনুন্নত আর পুঁজিবাদী দেশের পক্ষে।

নবেম্বর, ১৯৬৭

সংবাদপত্র জগতের একটি স্মরণীয় নাম

এ নাম তফাজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়া। নাম বল্লেই সবটা বলা হয় না তার সম্পর্কে, তিনি ছিলেন আমাদের সংবাদপত্র জগতে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। কালের দিক দিয়ে আমাদের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে দীর্ঘতর ঐতিহ্যের অধিকারী আরো কেউ যে নেই তা নয়; কিন্তু মানিক মিয়ার ব্যক্তিত্ব ছিল সবার উর্ধ্বে। এ ব্যক্তিত্ব অর্জনে তাঁর সহায়ক ছিল একদিকে তার প্রত্যয়, অন্যদিকে তাঁর স্বনির্ভরতা। বলা-বাহুল্য, তিনি ছিলেন তাঁর পত্রিকার সর্বেসর্বা। কারো মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁকে কথা বলতে হয়নি কোনদিন, ছিলেন নিজেই তাঁর পত্রিকার নীতিনির্ধারক, সে নীতির নিয়ন্তা আর রূপকার। আমাদের দেশের অনেক সংবাদপত্র-মালিক আর পরিচালক নিজেরা লেখেন না বা লেখার তেমন যোগ্যতা তাদের সকলের নেই। এমনকি সম্পাদক হিসাবে যাঁদের নাম কাগজের পাতায় মুদ্রিত হয়, তাদেরও কেউ কেউ নেন না নিয়মিত লেখার দায়। সহ-সম্পাদকরাই পালন করেন সে দায়িত্ব। কিন্তু মানিক মিয়া ছিলেন ব্যতিক্রম। সব সময় সম্পাদকীয় না লিখলেও একটা বিশেষ কলাম বা স্তম্ভ তিনি নিয়মিতই লিখতেন। ইদানীং শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ার পর তা কিছুটা অনিয়মিত হয়ে পড়েছিল। এ কলামই ছিল 'ইত্তেফাকে'র এক বড় বৈশিষ্ট্য আর দুর্দমনীয় আকর্ষণ। অনেকে 'ইত্তেফাক' পড়তেন স্রেফ এ কলামের জন্যেই। যে-কোন লেখক ও সাংবাদিকের জন্য এ এক মস্ত বড় কৃতিত্ব।

আমার লেখক-জীবন কম দীর্ঘ নয়, পাঠক-জীবন আরো দীর্ঘতর। আমার সমসাময়িক যুগের নবীন প্রবীণ প্রায় সব লেখকের সঙ্গেই কম-বেশী আমার পরিচয় আছে। সাক্ষাতে না হলেও নামে ত বটেই। কিন্তু তফাজ্জল হোসেন বা মানিক মিয়া নামে কোন লেখকের নাম আমার জানা ছিল না—এমনকি শোনাও ছিল না। 'মোসাফির' ছদ্মনামে কোন একজন

কৃতবিদ্য ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক ইত্তেফাকের রাজনৈতিক মঞ্চ লেখেন, এ ধারণা দীর্ঘকাল আমার মনে বদ্ধমূল ছিল। চিন্তায় অমন স্বচ্ছ ঋজুতা, প্রকাশ-শৈলীতে অমন বলিষ্ঠ নিজস্বতা—পাকা লেখক ছাড়া কারো করায়ত্ত, এ আমার বিশ্বাস হত না। পাকিস্তানের আগে 'কৃষক' আর 'ইত্তেহাদে' জনাব আবুল মনসুর আহমদকে এ ধরনের রসসমৃদ্ধ রাজনৈতিক লেখা লিখতে দেখেছি। আর সে-সব লেখা পড়ে আমরা অপরিসীম আনন্দ পেতাম। তাই আমি মনে মনে ধরে নিয়েছিলাম 'মোসাফির' আবুল মনসুর ছাড়া আর কেউই নন। তাছাড়া আমাদের জানা ছিল, আবুল মনসুর সাহেব কোন কোন সাময়িকীর সম্পাদকীয় লিখে দিতেন বেনামীতে বা কোনরকম নাম ছাড়াই। এসব কারণে 'মোসাফির'কে আমি আবুল মনসুর বলেই মনে করতাম। ঢাকা থেকে দূরে থাকি বলে আমার এ ভুল ভাংতে অনেক কাল লেগেছিল। আর ভুলটা ভেঙ্গে দিয়েছিলেনও স্বয়ং আবুল মনসুর সাহেবই। সন তারিখ মনে নেই, যুক্তফ্রণ্টের ভাঙ্গাগড়ার দু'এক বছর পরে বোধকরি, ঢাকায় কোন এক সাহিত্য অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে আবুল মনসুর সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হলে সোজা জিজ্ঞাসা করেছিলাম ইত্তেফাকের 'রাজনৈতিক মঞ্চ' আপনারই ত লেখা? তিনি হেসে বলেছিলেন: না। বিস্মিতকণ্ঠে জানতে চাইলাম: তবে কার? কে লেখেন ঐ মঞ্চ? বললেন: স্বয়ং সম্পাদক মানিক মিয়াই লেখেন। সব তাঁরই লেখা। আমার ভুল ভাংলো বটে, কিন্তু বিস্ময়ের বড় কারণ—যে লেখকের সূচনা দেখিনি, প্রস্তুতি-পর্বের কোন খবর রাখি না, তফাজ্জল হোসেন বা মানিক মিয়া নামে কোন লেখাই যাঁর পড়িনি জীবনে, তেমন এক অজ্ঞাতনামা লেখকের কলম থেকে কি করে এমন পাকা লেখা বের হওয়া সম্ভব! কত লেখকেরই ত আবির্ভাব ঘটে। সাময়িকীর পৃষ্ঠায় নিজের নামটা মুদ্রিত দেখে কত লেখকই ত যান হারিয়ে। তেমন হারিয়ে যাওয়া লেখকদের মধ্যেও তফাজ্জল হোসেন কিংবা মানিক মিয়া নাম কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। হঠাৎ এমন পাকাপোক্ত কলম সত্যই আমার কাছে অপ্রত্যাশিত। আমি অবাক হয়েছিলাম বিশেষ করে এ কারণে।

তাঁর সঙ্গে আমার চাক্ষুস দেখা মাত্র একবার। খুব সম্ভব ১৯৬৪ কি '৬৫টিতে চট্টগ্রামের হোটেল শাহজাহানে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু বার্ষিকী পালনের প্রস্তুতি উপলক্ষে এক আলোচনা সভা আহূত হয়েছিল।

তখন কি এক কার্যোপলক্ষে মানিক মিয়া চাটগাঁ এসেছিলেন, সভার আহ্বায়করা তাঁকেও করেছিলেন নিমন্ত্রণ। সে সভাতেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম ও শেষ দেখা। সভার উদ্যোক্তারা তাকেই সভাপতিত্ব করার অনুরোধ জানালে আমি উপস্থিত আছি জেনে তিনি কিছুতেই সভাপতি হতে রাজী হলেন না এবং নিজেই প্রস্তাব করে বসলেন আমার নাম। তার এ সৌজন্যটুকুও আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। ঘটনাটি ক্ষুদ্র কিন্তু এতে লেখক আর সাহিত্যিকদের প্রতি মানিক মিয়ার গভীর শ্রদ্ধাবোধের পরিচয় রয়েছে। এ স্বল্পস্থায়ী সাক্ষাতের আগে ও পরে তার কাগজে অর্থাৎ ইত্তেফাকে আমার বহু লেখাই ছাপা হয়েছে। আমার যে-সব লেখা অন্য কাগজের পক্ষে হজম করা কঠিন ছিল, আমার তেমন বহু লেখাই ইত্তেফাক হজম করেছে—আমার বহু বক্তব্য ইত্তেফাকের মারফত অগণিত পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবার সুযোগ আমি এভাবে পেয়েছি। আমার মত লেখকের জন্যে এ সুযোগটুকু মহামূল্যবান। দেশ ও জাতির প্রতি কর্তব্যের তাগাদায় যারা লেখেন, প্রকাশের অবাধ সুযোগ তাদের জন্য অত্যাবশ্যক—এছাড়া দায়িত্বশীল লেখকের ভূমিকা পালন তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। মানিক মিয়া আর তার সহকর্মীরা এ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন বলে লেখককে মতামত প্রকাশের সুযোগ দিতে 'ইত্তেফাক' কখনো দ্বিধা করেনি, এমনকি অনেক সময় সরকারী রোষের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও। মানিক মিয়া আর 'ইত্তেফাক' নির্ভীক সাংবাদিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে আমাদের দেশে। ইত্তেফাকের অসাধারণ জনপ্রিয়তার মূল কারণও বোধ করি এখানে।

মানিক মিয়ার নিজের ব্যক্তিত্ব ইত্তেফাকে প্রতিফলিত হবে আর সেটাই ইত্তেফাকের বৈশিষ্ট্য ও নিজস্বতা। বলা বাহুল্য, ব্যক্তিত্ব শারীরিক ব্যাপার নয়। তা নির্ভর করে না দৈহিক আকার-প্রকারের উপর। ব্যক্তিত্ব মন আর চরিত্রেরই সমন্বয়, তারই অন্বিত রূপ। মানিক মিয়া তেমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ছিলেন তার সর্বলেখা—সে সম্পাদকীয়, রাজনৈতিক মঞ্চ কিংবা হলেন রঙ্গমঞ্চ যাই হোক না কেন, সবই ছিল তার ব্যক্তিত্বের রঙে রঞ্জিত। Style is the man অর্থাৎ রচনাশৈলীই মানুষটা—এ কথা এ-যুগের সাংবাদিকদের মধ্যে একমাত্র মানিক মিয়া সম্বন্ধেই বোধ করি যথার্থভাবে প্রয়োগ করা যায়। তার লেখার মধ্যেই তাঁকে পাওয়া যেতো। পাওয়া যেতো তার ভিতরের মানুষটার

পুরোপুরি পরিচয়। তাঁর মতামত আর দেশের বিভিন্ন সমস্যার প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী যেমন ছিল স্পষ্ট ও দ্বিধাহীন, তেমনি তার ভাষা আর প্রকাশশৈলী ছিল স্বচ্ছ, প্রত্যয়ী জীবন্ত আব অকুণ্ঠ বক্তব্যে দীপ্ত ও উজ্জ্বল। মনে হয় তাঁর বক্তব্যের সাথে সাথেই যেন তাঁর ভাষাও রূপ নিতো। তাঁর গদ্য, তাঁর ব্যক্তিত্ব তথা নিজস্বতারই এক চমৎকার নিদর্শন। সাধারণতঃ কথ্য রীতি বলিতে যা বুঝায় তাঁব গদ্য তা ছিল না, কিন্তু কথ্যরীতির অনেক বৈশিষ্ট্যই তাঁর রচনার গায়ে একাত্ম হয়ে মিশে থাকতো। তার ফলে তাঁর ভাষা একদিকে যেমন সহজবোধ্য ছিল, যেমনি অন্যদিকে তা ছিল বৈশিষ্টতায় সমুজ্জ্বল। এমনকি অন্যের লেখা ইত্তেফাকের সম্পাদকীয় থেকেও তা ছিল আলাদা। দেশজ শব্দ আব দেশজ বাগ্‌বিধিব যথাযথ প্রয়োগের ফলে তার ভাষা অনেক সময় একটা ঘরোয়া আমেজের সৃষ্টি করতো, ফলে তা হতো অত্যন্ত উপভোগ্য। এভাবে একটা রসসমৃদ্ধ রচনাশৈলী তিনি নিজের জন্য গড়ে তুলছিলেন, এও কম কৃতিত্বের কথা নয়। একমাত্র জাত লেখকরাই এ অসাধ্য সাধন করতে পারেন—অর্থাৎ নিজস্ব রচনাশৈলী উদ্ভাবন আব গড়ে তোলা তা খাঁটি লেখকদেরই লক্ষণ। তাঁর রচনাশৈলীর মতো তার মতামতও কোনবকম ধারকরা বস্তু ছিল না। তা ছিল তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস আর উপলব্ধিজাত। তাই তাতে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্বের স্থান ছিল না। ঘটতো না তাতে কোনরকম দুর্বলতা কি শৈথিল্যেব অনুপ্রবেশ, না ভাষায়—না বক্তব্যে। রচনায় এমন দৃঢ় প্রত্যয়ী ব্যক্তিত্বের সোচ্চাব রূপ এক নজরুলে ছাড়া আমি অন্যত্র দেখিনি।

দৈনিক পত্রিকার আয়ু সাধারণতঃ দিনান্তেই শেষ। সূর্যোদয়ের সঙ্গে যার আবির্ভাব, অনেক সময় সে সূর্য মধ্যগগনে পৌঁছার আগেই ঘটে তার তিরোভাব। এতো নিত্য নৈমিত্তিক আর প্রাত্যহিক ব্যাপার। কিন্তু মানিক মিঞাব সাংবাদিক রচনার বেলায় এর ব্যতিক্রম আমি একাধিকবার দেখেছি। দেখেছি মোসাফির রচিত 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কেউ কেউ শুধুমাত্র একবার পড়ে তৃপ্তি পেত না, বার বার পড়ে উপভোগ করতো। রচনার এ যাদুশক্তি মানিক মিয়ার করায়ত্ত ছিল, আর এ ছিল তাঁর কাছে সহজাত। সহজাত বলছি এ কারণে, তার জীবনে লেখা কি সাংবাদিকতায় কোন শিক্ষানবীশির কথা শোনা যায়নি। দেশ, ধর্ম, অঞ্চল ও জাতিগত স্বার্থে আমরা অনেক সময় আবেগের স্রোতে ভেসে যাই। মানিক মিয়া যুক্তিবাদী ছিলেন, তাই সহজে তিনি আবেগের শিকার হতেন না। তাঁর অনেক

রচনায় যুক্তির শাণিত তলোয়ার যেন ঝলমল করে উঠত। অমন ঋজু, স্বচ্ছ, সহজবোধ্য, তীক্ষ্ণ ও সরস গদ্য সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় খুব কমই দেখা যায়। মাঝে মাঝে বিদ্রূপের সুতীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ তাঁর কলমের মুখে যেভাবে ঝলসে উঠতো, তা বিস্ময়কর।

ইংরেজীতে যাকে Self-made বলা হয়, মানিক মিয়া ছিলেন তাই—ব্যক্তিজীবনে যেমন, তেমনি সাংবাদিক জীবনেও। এক হাতে গড়ে তুলেছিলেন তিনি নিজের ব্যক্তি-জীবনকে, অন্য হাতে সাংবাদিক জীবন। ইত্তেফাক বলতে যেমন আমরা মানিক মিয়াকেই বুঝতাম, তেমনি মানিক মিয়া বলতেও বুঝতাম ইত্তেফাককে। দুইকে আলাদা করে ভাবা যেন সম্ভবই হতো না। দুই-ই পাশাপাশি চলেছে, দুই-ই পাশাপাশি গড়ে উঠেছে। দু'য়ের মধ্যে কোন বিরোধ কি গড়মিল দেখা দেয়নি কোনদিন। এও তাঁর যোগ্যতা, সাংগঠনিক দক্ষতা আর সাফল্যের পরিচায়ক। নিঃসন্দেহে মানিক মিয়ার মৃত্যুকে অকালমৃত্যুই বলতে হবে। তবুও তাঁর জীবন অসফল, একথা বলা যায় না। এযুগে এও এক বিরল নজির। দেশকে তিনি একটি শক্তিশালী সংবাদপত্র দিয়ে গেছেন, যা আজ জনগণের মুখপত্র ও জনগণের কণ্ঠস্বর। দেশ ও জনগণের স্বার্থ নিয়ে ইত্তেফাক ও মানিক মিয়া কোনদিন আপস করেন নি। তারজন্য ইত্তেফাক আর মানিক মিয়াকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। এতখানি মূল্য আমাদের দেশের অন্য কোন সংবাদপত্র কিম্বা সাংবাদিক দিয়েছেন কি-না সন্দেহ।

দেশ স্বাধীন হলেও দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা জনগণের হাতে আজও আসেনি। ফলে জনতার স্বার্থে আর রাষ্ট্র-পরিচালকদের স্বার্থে সংঘর্ষ প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠতো সব সময়। এ অবস্থায় জনস্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করা বা মুখপত্র কি মুখপত্র হওয়া সত্যই কঠিন ও দুঃসাধ্য। মানিক মিয়া স্বেচ্ছায় এ কঠিন ও দুঃসাধ্যকেই বরণ করে নিয়েছিলেন—তাই তিনি ও তার পত্রিকা হতে পেরেছে জনগণ-মন-প্রিয়। তাঁর মতো নির্ভীক ও দুঃসাহসী সম্পাদক সত্যই সব দেশে, সব যুগেই বিরল। আমাদের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তিনি নিজেই যেন এক ইতিহাস। আমাদের দেশে রাজনৈতিক সাহিত্য আজও দুর্নিরীক্ষ—রাজনীতি আর সাহিত্যে এ দু'য়ের যোগফল কদাচিৎ দেখা যায়। বলাবাহুল্য, এ দু'য়ের যোগফলই রাজনৈতিক সাহিত্য। মনে হয়, মানিক মিয়ার 'রাজনৈতিক মঞ্চের' অনেক রচনাই এ দাবি করতে পারে। মানিক মিয়ার কৃতিত্ব আর অবদানও স্মরণীয়।

পূর্ব পাকিস্তানের নাম বাংলা হোক

অতি প্রাচীনকালে, বৈদিক যুগে এ দেশের অর্থাৎ পূর্ববাংলার নাম ছিল 'বঙ্গ' আর এখানকার প্রচলিত বর্ণমালাকে বলা হতো 'বঙ্গলিপি'। এ নাম ঐতিহাসিক—নানাভাবে সাহিত্যে বিবৃত, বর্ণিত আর কীর্তিত। ইতিহাসের বিচিত্র উত্থান-পতনে, প্রশাসনিক প্রয়োজনের তাগাদায় কালক্রমে এ ভূখণ্ডের পূর্ব আর পশ্চিম অঞ্চল বঙ্গ বা বাংলাদেশ এ এক নামেই পরিচিত হয়ে পড়ে। ১৯৪৭-এর ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত এ নামই ছিল এ গোটা দেশের। স্বাধীনতার শর্তানুসারে পাঞ্জাবের মতো বঙ্গদেশও বিভক্ত হয়। অধিবাসীদের ধর্মানুসারে এ দুই প্রদেশের বৃহত্তর অংশ পাকিস্তানের ভাগে এসে পড়ে। তখন থেকে বিভক্ত এ দুই প্রদেশ রূপান্তরিত হয় চার প্রদেশে আর পাকিস্তানের ভাগে পড়া দুই প্রদেশের নাম হয়ে পড়ে পূর্ব বঙ্গ বা পূর্ব বাংলা আর পশ্চিম পাঞ্জাব। ভারতের ভাগে পড়া দুই প্রদেশের নাম দাঁড়ায় পশ্চিম বঙ্গ বা পশ্চিম বাংলা আর পূর্ব পাঞ্জাব। বলা বাহুল্য পাকিস্তান পূর্ব আর পশ্চিম দুই অংশে বিভক্ত। পশ্চিমাংশ অনেকগুলি ছোট প্রদেশের সমন্বয়ে গঠিত। পূর্বাংশ তার ঠিক বিপরীত—এ সম্পূর্ণ এক প্রদেশ-ভিত্তিক, অধিবাসীও একই ভাষাভাষী। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রত্যেকটি প্রদেশের স্বতন্ত্র ভাষা রয়েছে। এই নামে প্রায় দশ বছর চলার পর—দেশের শাসকরা সিদ্ধান্ত নিলেন পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে স্বতন্ত্র প্রদেশ আর রাখা হবে না। সব কটা প্রদেশকে প্রশাসনিক কর্তৃত্বে নিয়ে এসে একটি মাত্র প্রদেশে রূপান্তরিত করা হবে। তাই করা হলো এবং নাম দেয়া হলো পশ্চিম পাকিস্তান। ফলে পূর্বাংশেরও তখন থেকে নাম হলো পূর্ব পাকিস্তান। এভাবে সৃষ্টি হলো পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তান।

এখন আবার গণেশ উল্টে গেছে। বর্তমান শাসকরা—পশ্চিম পাকিস্তানে এক প্রদেশ বনাম এক ইউনিটের ব্যর্থতা দেখে ঘোষণা

করেছেন, এক প্রদেশ তথা এক ইউনিট আর রাখা হবে না—প্রদেশগুলি তাদের প্রশাসনিক স্বাতন্ত্র্য আবার ফিরে পাবে পূর্বের মতো। অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তান নাম আর থাকলো না। আগের মতো ঐ এলাকা এখন থেকে পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ইত্যাদি নামেই হবে পরিচিত। এ অবস্থায় পাকিস্তানের পূর্বাংশের নাম পূর্ব পাকিস্তান থেকে যাওয়ার কোন মানে হয় না। আমাদের রাষ্ট্রের নাম পাকিস্তান আর এ নাম থাকবেই কিন্তু এর অংশগুলির ঐতিহাসিক নাম মুছে ফেলার প্রয়োজন এখন নিঃশেষিত। অতএব প্রদেশগুলি সাবেক নাম এখন ফিরে পাবে। ভারতেও সার্বিক রাষ্ট্রীয় নাম ভারতবর্ষ, কিন্তু সে নাম তারা কোন প্রদেশের উপর আরোপ করেনি। প্রদেশগুলি সাবেক নামেই চিহ্নিত রয়ে গেছে। পরিবর্তিত অবস্থায় স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের দাবিতে অতি সামান্যই রদবদল ঘটিয়েছে মাত্র ওরা।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ কোন অর্থবহ নাম নয়, স্রেফ দিক-নির্দেশক মাত্র। ঐ নাম অচিরে পরিবর্তিত হওয়া উচিত। ওখানকার অধিবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি ঐ অঞ্চলের নাম পাখতুনিস্তান বা পাখতুন রাখার। এ দাবি ন্যায়সঙ্গত বলেই মনে হয়। বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান প্রভৃতি জাতি বা ভাষা-বাচক নামে যদি কোন আপত্তি না থাকে তবে পাখতুনের বেলায় আপত্তির কারণ থাকবে কেন?

পাখতুন-আন্দোলনের প্রধানতম নেতা খান আবদুল গফ্ফার খাঁ তো একাধিকবার দ্ব্যর্থ ভাষায় ঘোষণা করেছেন—সাবেক উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের নামটাই শুধু বদলে পাখতুন বা পাখতুনিস্তান রাখার দাবি তারা করছেন। পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোন দাবি তাঁদের নেই—পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের মতো পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে এও আর একটা প্রদেশই থাকবে। এ দাবি অনায়াসে মেনে নেয়া যায়।

আমাদের প্রত্যেকটা প্রদেশের আর প্রদেশের মানুষের শুধু যে ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য রয়েছে তা নয়, আচার-ব্যবহার আর জীবনাচরণেও অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যুগ-যুগান্তরে ঐতিহাসিক বিচিত্র ধারা বেয়ে এগুলি জন-জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়েছে। এখন যা প্রাদেশিক ঐতিহ্যে পরিণত। এসবকে মুছে ফেলে একাকার করার চেষ্টা কখনো সফল হবে না। এক ইউনিটের ব্যর্থতা তার এক নিঃসন্দেহ নির্দেশক। এক ইউনিট-বিরোধিতার অন্যতম কারণ ভাষাগত ঐতিহ্য চেতনা।

প্রায় দেখা যায় আমাদের শাসকরা কিছুটা অদূরদর্শী হয়ে থাকে—জাতিকে এদের অদূরদর্শিতার বহু খেসারত দিতে হয়েছে। এক ইউনিট, রাজধানী স্থানান্তর ইত্যাদি খেসারত। অতীতে রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারেও চরম অদূরদর্শিতা দেখা গেছে। এক ইউনিট বাতিলের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তান নাম যখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো, তখন কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত পূর্ব পাকিস্তানকে বঙ্গদেশ বা বাংলা নামে চিহ্নিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা। এর জন্য স্বতন্ত্র আন্দোলনের কিংবা গণদাবির প্রতীক্ষায় বসে থাকার কোন মানে হয় না। তাতে অবিশ্বাস আর তিক্ততাই শুধু বৃদ্ধি পাবে।

সাবেক বাংলাদেশের প্রধান অংশ আমাদেব পূর্ববাংলা, বাংলা ভাষাভাষী লোকসংখ্যার দিক দিয়েও আমবাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। অতএব সাবেক আমলের গোটা নামটা আমাদের প্রাপ্য। আমরা কেন পূর্ববাংলা লিখতে যাবো? আমাদের প্রদেশের নাম বঙ্গ বা বাংলাই হওয়া উচিত। ক্ষুদ্র বা ক্ষুদ্রাংশই নিজেকে খণ্ডিত বা ক্ষুদ্রভাবে চিহ্নিত করে থাকে। ভারত বা ইণ্ডিয়া এক সময় সারা উপমহাদেশেরই নাম ছিল, বৃহত্তর অংশের অধিকারী বলে ওখানকার রাষ্ট্র আর মানুষ সে নামই ব্যবহার করছে এখনো। এ যে ওদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার তা অস্বীকার করা যায় না। সে যুক্তি অনুসারে আমরাও আমাদের প্রদেশের বঙ্গ বা বাংলা নাম ব্যবহাবেব অধিকারী। 'পশ্চিম পাকিস্তান' নাম বিলুপ্তির পর রাষ্ট্রীয়ভাবে আমাদের এ অধিকার এখন স্বীকৃতি পাওয়া উচিত। সেভাবে পশ্চিম পাঞ্জাবেরও এখন থেকে স্রেফ পাঞ্জাব নাম হওয়াই সঙ্গত। কারণ সাবেক পাঞ্জাবের বৃহত্তর অংশ শুধু এলাকার দিক থেকে নয়, জনসংখ্যার দিক থেকেও পাকিস্তানের ভাগেই পড়েছে। ভারতীয় অংশ পূব পাঞ্জাব নামে অভিহিত হতে থাক, কিন্তু পাকিস্তানী অংশ এখন থেকে শুধু পাঞ্জাব নামেই পরিচিত ও অভিহিত হোক এ আমরা চাই। যেমন আমবা চাই পূর্ব পাকিস্তান এখন থেকে বঙ্গ বা বাংলাদেশ নামেই অভিহিত হোক।

দণ্ড আর দণ্ডিত

অপরাধ আর অপরাধীর দণ্ডবিধান এক চিরন্তন স্বীকৃত রীতি। সুপ্রাচীনকাল থেকেই সব দেশে, সব সমাজে অপরাধ যেমন ঘটে, ঘটতে দেখা যায় সব সময়, তেমনি দেখা যায় তার বিচার আর শাস্তিরও বিচিত্র বিধি-বিধান। সামাজিক শান্তি, শৃঙ্খলা আর নিরাপত্তা এসব বিধি-বিধান আর তার কার্যকারিতার উপরই নির্ভরশীল। তাই আজকের দিনে ধরে নেয়া হয় সভ্যতা মানে আইনের শাসন। সভ্য রাষ্ট্রের প্রথম বুনিয়াদ আইন। আইন মোতাবেক আইনের প্রয়োগ—তথা সর্বতোভাবে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে বিচার করে দণ্ডদান। অবশ্য অপরাধের তারতম্যানুসারে দণ্ডেও তারতম্য না ঘটে পারে না। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে ফাঁসিরও বিধান আছে আইনে। আবার যথাযথ প্রমাণের অভাবে প্রকৃত অপরাধীও অনেক সময় পেয়ে যায় খালাস—তাতে আইনের মূল্য আর প্রয়োজন কিন্তু কমে না। আধুনিক আইন বলে: দশজন অপরাধীও যদি খালাস পায় পাক, কিন্তু একজন নিরপরাধও যেন না হয় দণ্ডিত।

বিচার যদি আইন মাফিক হয়, অপরাধীকে যত কঠিন দণ্ডই দেওয়া হোক, তাতে কারো আপত্তি থাকে না বরং দুষ্টের দমনে মানুষ খুশীই হয়। তবে স্মরণীয় ফাসীর আসামীও মুহূর্তে অমানুষ হয়ে যায় না। লোপ পায় না তার সবরকম মানবিক আবেগ, অনুভূতি ও চেতনা দণ্ডের সাথে সাথে। ফাঁসির রজ্জু গলায় পরার মুহূর্তেও সে মানুষই থাকে মানবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখবোধ তখনও থাকে তার মধ্যে সজীব। তাই মৃত্যুমুহূর্তেও তার প্রতি যথাসম্ভব মানবিক ব্যবহারই করা হয়ে থাকে তাবৎ সভ্যদেশে। এমনকি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাকে দেয়া হয় খেতে। দেয়া হয় প্রার্থনা করতে চাইলে প্রার্থনা করার সুযোগ। এমনও শুনেছি, সে কি খেতে চায়, কাকেও দেখতে চায় কি না শেষবারের মতো, এও নাকি জানতে চাওয়া হয় তার কাছে। এসবই আসামীর মানবিক আবেগ-

অনুভূতির প্রতি এক নিঃসন্দেহ স্বীকৃতি। সম্পূর্ণ নিষ্ফল জেনেও মানবতার প্রতি এ শ্রদ্ধাটুকু না জানিয়ে মানুষের বিবেক যেন পায় না স্বস্তি। এভাবে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী দণ্ডদাতাও মেনে নেয় চরম অপরাধে অপরাধী দণ্ডিত লোকটিও মানুষ, মানবিক চেতনাবিবর্জিত এক জড় বস্তুতে সে হয়নি রূপান্তরিত। এ একটি ক্ষেত্রে অন্ততঃ দণ্ডদাতা আর দণ্ডিত সমান, একই সমতলে এক আসনে আসীন! সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডিত অপরাধীর প্রতি ব্যবহারেও ক্রমোন্নতি সব দেশেই লক্ষ্যগোচর, আর সে অগ্রগতি মোটেও অধিকতর নিষ্ঠুরতার দিকে নয় বরং অধিকতর সুবিবেচনার সাথে মানবিক হওয়ার দিকেই এর গতি। হঠাৎ উপরের কথাগুলো বলার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এ কারণে যে, সম্প্রতি আমাদের প্রায় তিন শতাধিক উচ্চ সরকারী কর্মচারীকে নানা ধরনের দুর্নীতির অভিযোগে সাময়িকভাবে বরখাস্ত, তথা সাস্পেণ্ড করা হয়েছে। সরকারের এ সিদ্ধান্তের সমীচীনতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করা বা সে সম্বন্ধে কোন আপত্তি তোলাব বাসনা আমাদের নেই। আমার বিশ্বাস, যথাযথ প্রমাণের ভিত্তিতেই সরকার এমন চরম পন্থার আশ্রয় নিয়েছে। অধিকন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে দণ্ডিত অফিসারদের বক্তব্য পেশ তথা নিজেদের নির্দোষিতা প্রমাণের সুযোগ-সুবিধারও ব্যবস্থা নাকি রাখা হয়েছে। কাজেই বিচারটা একতরফা না হওয়ারই কথা।

এ প্রসঙ্গে আমার আপত্তিটা দণ্ডিত অফিসারদের নামধাম-সহ সরকারী সিদ্ধান্তটা জনসমক্ষে প্রচার আর প্রকাশের সময় সম্পর্কেই শুধু। ঠিক শবে-কদরের সময়, মুসলমানের সর্বশ্রেষ্ঠ পরব ঈদের মাত্র তিন-চারদিন আগে সাময়িক বরখাস্তের এ চিঠিগুলো সরকার ইস্যু না করলেই সুবিবেচনার পরিচয় দেয়া হতো। ঈদের পর চিঠিগুলো ইস্যু করা হলে দেশ বা সরকার মোটেও রসাতলে যেতো না। আইন আর প্রশাসনের দিক থেকেও তেমন কোন মারাত্মক ক্ষতি হতো বলে মনে হয় না। আর এলোকগুলোও যে দু'চারদিনে দেশ ছেড়ে পালাতো তাও বিশ্বাসযোগ্য নয়।

ঈদ মুসলমানের জন্য সব চেয়ে বড় উৎসবের দিন। এ উৎসব শুধু ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক স্তরে সীমিত নয়। দেশ, রাষ্ট্র আর জাতির সীমা ছাড়িয়েও এর ব্যাপ্তি। মুসলমানের জন্য এ এক সার্বজনীন আর বৈশ্বিক উৎসব। এ-সব অফিসারেরা কেউই বিচ্ছিন্ন

একক মানুষ নয়, এদেরও পরিবার, ছেলেমেয়ে, আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। ওদের সবাইকে নিয়েই ওদেরও ঈদ। অনেকের পরিবার-পরিজন এদের অপরাধ সম্বন্ধে হয়তো ওয়াকিফহালও নয়। আসন্ন ঈদের আনন্দ মুহূর্তে ঐ সব সরকারী চিঠি এদের সবাইর জীবনে এক অপ্রত্যাশিত নির্মম দুর্ঘটনার মতই নেমে এসেছে। কোন রকম অপরাধে অপরাধী না হয়েও এ সব পরিবারের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জীবনে এবার যেন ঈদের চাঁদ উদিতই হলো না। ঈদের দিনে এমন একটা দুঃসহ শোক আর বেদনা থেকে এদের অনায়াসে নিষ্কৃতি দেওয়া যেতো যদি সরকার এ সব চিঠি ইস্যু করার সময় একটুখানি মানবিক সুবিবেচনার পরিচয় দিয়ে দু'চারদিন দেরী করতো। ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামী পরব-উৎসবেও যদি মানুষের প্রতি একটুখানি সহানুভূতি আর সুবিবেচনার পরিচয় দেওয়া না হয় তা হলে তা কিছুটা দুঃখের বিষয় হয় বৈকি। বিশেষতঃ যখন দেখা যাচ্ছে এতে সমাজ কিম্বা রাষ্ট্রের কিছু মাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না। বলা বাহুল্য, কোন পরব-উৎসবই শুধুমাত্র নিরপরাধের জন্য নয়।

আমার বিশ্বাস, চরম দণ্ডদানের সময়ও যদি অপরাধীর মানবিক আবেগ-অনুভূতির প্রতি কিছুটা সুবিবেচনার পরিচয় দেওয়া হয় তা হলে দণ্ডদাতার প্রতি শুধু অন্যের নয় দণ্ডিতেরও আস্থা আর শ্রদ্ধা অনেকখানি বেড়ে যায়। শুনেছি সাময়িকভাবে বরখাস্তের, তথা সাস্‌-পেনসনের চিঠিগুলো অনেকে পবিত্র শবে-কদরের কিংবা তার আগের দিন মাত্র পেয়েছে। ধর্মীয় সব কিছুর বেলায় যথেচ্ছ 'পবিত্র' বিশেষণ ব্যবহারে আমরা অভ্যস্ত, যেমন 'পবিত্র রমজান', 'পবিত্র শবে-কদর' 'পবিত্র ঈদ' ইত্যাদি আরো বহু ব্যাপারে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এ ব্যবহার করা হয় কোন রকম চিন্তা না করেই। কিন্তু 'পবিত্রতা' যদি আমাদের জীবনে আর ব্যবহারে কোন রকম মানবিক রূপ না নিয়ে স্রেফ অদৃশ্য এক নির্বস্তুক বিমূর্ত কয়েকটি হরফের সমষ্টি হয়েই থাকে তা হলে তাতে কার কি লাভ? ধর্মীয় কিম্বা ধর্ম-নিরপেক্ষ যে-কোন বিষয়ে আবেগ গদ গদ যে-কোন বিশেষণেরই প্রয়োগ স্রেফ নিরর্থক, যদি না ব্যক্তি আর সমাজ জীবনে তার প্রতিফলন দেখা যায়। এ নিরর্থকতার নজির আমাদের জীবনে ভূরি ভূরি।

শাসন আর মানবিক বিবেচনা

দেশ থাকলে দেশে শাসন, বিচার, দণ্ড ইত্যাদিও থাকবে। কারণ দেশ মানে মানুষ আর মানুষের যৌথ বা সামাজিক জীবনের এসব অচ্ছেদ্য অঙ্গ। মানুষ অপরাধ করে আবার মানুষই বিচার করে অপরাধীকে, দিয়ে থাকে দণ্ড। এর জন্য প্রয়োজন আইন, আইনের বিধি-বিধান—এ আইন, আর তার বিধি-বিধানও মানুষের তৈয়ারী। এসবের প্রয়োগ-কর্তাও মানুষ। তাই মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত যা কিছু তাতে মানবিক বিবেচনা না এসে পারে না—মানবিক বিবেচনাকে স্থান দিতেই হয়, না দিলে তা অ-মানবিক হয়ে পড়ে, হয়ে পড়ে জড়বস্তু। তেমন অবস্থায় তা হারিয়ে বসে সব রকম মানবিক মূল্যবোধ। তাবৎ সভ্যদেশের আইন আর বিচারে তাই দেখা যায় এ মূল্যবোধের স্বীকৃতি। এখন আইন আর বিচারের লক্ষ্য কোথাও স্রেফ দণ্ডবিধান নয়—বরং লক্ষ্য সংশোধন, দণ্ডিতকে মানবিক মর্যাদায় নিজেকে প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেওয়া। তার যোগ্যতা আর গুণপনা বিকাশে সহায়তা করা। দণ্ডিতের স্বাধীনতা হরণ করা হয় বটে ; কিন্তু তার বিকাশ আর পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির সুযোগও যদি সে সঙ্গে কেড়ে নেওয়া হয় তা হলে আইন আর বিচারের লক্ষ্যকেই করে দেওয়া হয় ব্যর্থ। আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রে এ করা হয় বলে অনেক ছোট চোরও জেলখানা থেকে বের হয়ে এসে আরো বড় চোর হয়ে ওঠে। জেলে কোন একটা সৎ-পেশায় তাকে যোগ্য করে তোলা হয় না, তার সামনে খুলে দেওয়া হয় না তেমন কোন সুযোগ-সুবিধার দরজা। একটা মানুষকে কোন সৎ পেশায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া মানে তাকে মানব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা—অপরাধ বা অপরাধ-প্রবণতা থেকে চিরকালের জন্য মুক্তি দেওয়া। বিচার আর দণ্ডের এর চেয়ে সর্বোত্তম লক্ষ্য আর হতে পারে না। শিক্ষিত দণ্ডিতকে এ সুযোগ দেওয়া শুধু যে মানবিক তা নয়, রাষ্ট্র আর সমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্য এ করা আরো অধিকতর প্রয়োজন। এতে শুধু যে

ব্যক্তির উপকার হয় তা নয়, বৃহত্তর রাষ্ট্র-জীবনেও যোগ্য লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত আর বন্দীকে এ সুযোগ দেওয়া তাবৎ সভ্যদেশেরই এক স্বীকৃত রেওয়াজ।

ইংরেজের যত দোষই থাক, ইংরেজ যে আমাদের দেশেও একটা সভ্য শাসন ব্যবস্থা চালাতো তাতে কোন সন্দেহ নেই। অসহযোগ-খেলাফতের উত্তাল ও গণ-আন্দোলনের সময় বহু তরুণ ছাত্র আর শিক্ষার্থীও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, তাদের মধ্যে যারাই লেখাপড়া করতে কি পরীক্ষা দিতে চেয়েছে তাদেরে সে সুযোগ দেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনীয় বইপত্র পর্যন্ত করা হয়েছে সরবরাহ। জেলে থেকেই অনেকে যে আই.এ., বি.এ., এম.এ. পর্যন্ত পাস করেছে তার নজির দেদার। আমরা জানি, জেলে বসে অনেকে স্মরণীয় গ্রন্থও রচনা করেছেন—প্রয়োজনীয় বই-পুস্তক কর্তৃপক্ষই করে দিয়েছে সংগ্রহ। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সুবিখ্যাত 'আত্মজীবনী' আর মওলানা আকরম-খাঁর অবিস্মরণীয় অবদান 'মোস্তফা চরিত' শুনেছি জেলে বসেই লেখা। বিদেশী সরকারের কাছ থেকেও তাঁরা সেদিন সবরকম সহায়তা পেয়েছিলেন।

এমন কি পাকিস্তান হওয়ার পর ভাষা-আন্দোলনের সময়ও যারা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তারাও লেখাপড়া আর পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হননি। তেমন এক স্মরণীয় নজির অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী—শুনেছি তিনিও বাংলায় এম. এ. পাস করেছেন জেলে বসেই। আমার বিশ্বাস, সত্য-মিথ্যা প্রমাণিত অপ্রমাণিত যে-কোন অপরাধে যাকেই দণ্ডিত করা হোক না কেন, তাকেও এগিয়ে যাওয়ার, যোগ্যতা বৃদ্ধি আর বিকাশের সুযোগ দেওয়া হলেই আইন আর বিচার অধিকতর মানবিক হয়ে ওঠে আর আইন আর বিচারের আসল লক্ষ্য আর উদ্দেশ্যও তাতেই বেশী হাসিল হয়।

একথাগুলি বলার এখন বেশী করে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এ কারণে যে, সম্প্রতি এখানে-ওখানে কয়েকটি গোলযোগের ফলে কিছুসংখ্যক ছাত্র আর পরীক্ষার্থী ধৃত আর দণ্ডিত হয়েছে। এদের অধিকাংশই বয়সে তরুণ, কেউ কেউ একদম কিশোর। কাগজে প্রকাশিত হয়েছে এদের কেউ কেউ ম্যাট্রিক, কেউ কেউ-বা আই. এ. পরীক্ষার্থী—মাস-দু'মাসের মধ্যেই শুরু হবে এদের এসব পরীক্ষা। কেউ কেউ বিভিন্ন কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। সামরিক বা বেসামরিক যে আইনেই ওদের

দণ্ডিত করা হোক না কেন, সে সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রশ্ন বা বক্তব্য নেই। আমরা চাচ্ছি এদের মানবিক দিকের প্রতিই প্রশাসন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। পূর্ববর্তী দেশী কি বিদেশী শাসনামলে যেমন ছাত্র আর পরীক্ষার্থীদের লেখা-পড়া আর পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হতো না, এদেরও যেন তা করা না হয়। এরাও যেন জেলে বসে পড়াশোনা করতে, পরীক্ষার জন্য তৈয়ারী হতে পারে আর পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি যেন পায়। এদের এখন দেহমনে বেড়ে ওঠার বয়স—এরা যেন বেড়ে যোগ্যতর নাগরিক হয়ে ফিরে আসতে পারে, সে সুযোগ ওদেরে যেন দেওয়া হয়। এটা মানবিক দাবি। দণ্ডিতও সব সময় মানবিক বিবেচনার দাবি রাখে। সব সভ্য সমাজে ইহা স্বীকৃত।

এবারকার ধৃত আর দণ্ডিত ছাত্রদের প্রতি আমাদের সরকার আর প্রশাসন কর্তৃপক্ষ কিছুটা উদার আর সহানুভূতিশীল মনোভাব নিয়ে ওদেরে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিক, যারা পরীক্ষার্থী তাদেরে পরীক্ষা দেওয়ার সব রকম সুযোগ-সুবিধা দিক এটুকুই আমাদের নিবেদন। এসব ছাত্র এদেশের, এ সমাজেরই সন্তান, মেয়াদ অন্তে এদেশে এ সমাজেই তারা আসবে ফিরে। তারা যদি অধিকতর শিক্ষিত কিম্বা যোগ্যতর হয়ে ফিরে আসে, তাতে কি দেশ আর সমাজে অধিকতর লাভবান হবে না? যে দলেরই হোক, যে-কোন সভা-সমিতিতে গণ্ডগোল সৃষ্টিকে আমরা নিন্দা করি, আমরা শ্রদ্ধা করি পরমতসহিষ্ণুতাকে এবং বিশ্বাস করি পরমত-সহিষ্ণুতা শুধু যে গণতন্ত্রের প্রথম ও প্রধান শর্ত তা নয়, সব রকম সভ্যতা আর সভ্য জীবনেও প্রথম মধ্য আর অন্ত্য শর্তও এটি।

বুদ্ধঃ এক আলোক বর্তিকা

বুদ্ধকে অন্য এক লেখায় আমি 'মানব পুত্র' বলেছি। কথাটা আমার কাছে অর্থপূর্ণ। আর সে অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক এবং সার্বিক। মানব স্বভাবের এত গভীরে অন্য কেউ প্রবেশ করেছেন কিনা আমার জানা নেই। সত্যের সন্ধানে তিনি নিজে সংসার ত্যাগ করেছেন, কিন্তু প্রচলিত আত্ম-নির্যাতন-মূলক সন্ন্যাসকে করেছেন নিন্দা। মানুষের প্রয়োজনকে তিনি অস্বীকার করেননি কিন্তু অতিরেক আর অভিচারকে করেছেন নিষিদ্ধ। মানুষকে হতে বলেছেন মধ্যপন্থের অনুসারী। আর বলেছেন, এ হচ্ছে 'প্রজ্ঞা পারমিতা'য় পৌঁছার পথ। 'প্রজ্ঞা পারমিতা' মানে পরিপূর্ণ বিজ্ঞতা তথা Supreme wisdom—যেখানে ভুল-ভ্রান্তির নেই কোন অনুপ্রবেশ।

প্রাণের অধিকারী বলে মানুষও প্রাণী—প্রাণহীন মানুষ স্রেফ জড়-বস্তু, তখন জড়বস্তুর বেশী তার আর কোন মূল্য থাকে না। কাজেই প্রাণ এক অমূল্য সম্পদ, এক দুর্লভ ধন। মানুষই শুধু প্রাণের অধিকারী নয়—আরো অজস্র প্রাণী রয়েছে মর্ত্যধামে। বুদ্ধি আর বিজ্ঞতার অপরিহার্য অনুষঙ্গ যুক্তি—যুক্তি বলে সব প্রাণই অমূল্য, শুধু মানুষের প্রাণটাই মূল্যবান এ বুদ্ধি কিম্বা যুক্তি গ্রাহ্য নয়। অবিশ্বাস্য সাধনা আর দীর্ঘ আত্মনিবিষ্ট ধ্যানে মহামানব বুদ্ধ এ মহাসত্যের উপলব্ধিতে পৌঁচেছেন যে, সব প্রাণই মূল্যবান, সব প্রাণই পবিত্র। প্রাণ-হনন এক গর্হিত কর্ম। সর্ব জীবে দয়া, অহিংসা পরম ধর্ম,—এমন কথা আড়াই হাজার বছর আগে সত্যই অকল্পনীয় ছিল। মানুষ ত তখনো অরণ্য-বাসী—জীবহত্যা তথা প্রাণী-শিকারই ছিল মানুষের প্রধান জীবিকা তখন। যুবরাজ সিদ্ধার্থই ছিলেন এর অপবাদক। তখন বীরত্বের বা ক্ষত্রিয় ধর্মের পরাকাষ্ঠাই ছিল মৃগয়া বা পশু-শিকার। সিদ্ধার্থও ছিলেন ক্ষত্রিয় বংশাবতংস।

তাই ভেবে অবাক হতে হয় তেমন যুগে তেমন পরিবেশে কি করে একটা মানুষের এমন রূপান্তর ঘটলো। কোন অলৌকিক কিম্বা অপ্রাকৃত শক্তির আশ্রয় তিনি নেননি, পাননি তেমন কোন সহায়তাও। জানাননি তেমন কোন প্রার্থনা নিজেও কোন অদৃশ্য, অজ্ঞাত ও অপ্রামাণ্য শক্তির কাছে। সর্বতোভাবে নির্ভর করেছেন নিজের আত্মশক্তির উপর, নিজের সাধনা আর আত্মোপলব্ধির উপর। আত্মোন্মোচন ঘটেছে তাঁর এভাবে —এভাবে ক্ষত্রিয় রাজকুমার গৌতম পৌঁচেছেন বুদ্ধত্বে। মানবিক সাধনার এক চরম দৃষ্টান্ত বুদ্ধ-জীবন। ত্যাগ-সংযমের পথে যে সাধনা তাই মূল্যবান ও ফলপ্রদ। স্রেফ উপাসনা কিম্বা কর্মহীন প্রার্থনার কোন মূল্য নেই, তা শুধু নিষ্ক্রিয়তা আর জড়-অভ্যাসেরই দিয়ে থাকে প্রশ্রয়। এতে কোন আত্মোন্নতি ঘটে না, ঘটে না কোন রকম আত্মোপলব্ধি। অপরিসীম আর অবিরাম চেষ্টা আর উদ্যম-উদ্যোগ ছাড়া আত্মোন্নতি কিম্বা আত্মোপলব্ধির দ্বিতীয় কোন পথ নেই। আত্মোন্নতি ও আত্মোপলব্ধিরই এক নাম প্রজ্ঞা। অন্যান্য বহু ধর্মে বিশ্বাসের রয়েছে এক বড় স্থান, বিশ্বাসের উপর অত্যন্ত জোর দেওয়া হয় ঐসব ধর্মে। বুদ্ধ তা করেননি। তাঁর মতে কর্মহীন উপাসনা যেমন নিষ্ফল তেমনি নিষ্ক্রিয় জড় বিশ্বাস ও মূল্যহীন। মানুষের যা কিছু উপার্জন তা কর্মোদ্যমের পথেই লভ্য।

জ্ঞানের তথা প্রজ্ঞা-পারমিতার যে আলোক-বর্তিকা বুদ্ধ মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন তাও তিনি লাভ করেছেন এ পথেই। মনে হয় বুদ্ধের শ্রেষ্ঠত্বও এখানে—ব্যক্তিগত সাধনা ছাড়া তিনি অন্য কিছুর উপর নির্ভর করেননি। তাঁর জীবন ও শিক্ষা ব্যক্তিগত সাধনারই জয় ঘোষণা।

আত্মোপলব্ধি তথা প্রজ্ঞা-পারমিতায় পৌঁছার জন্য তিনি যে নির্দেশ দিয়েছেন, সে সবের দিকে তাকালেও বুঝতে পারা যাবে তিনি সর্বতোভাবে ব্যক্তিক সাধনার উপর দিয়েছেন জোর। দল বা সমাজবদ্ধ-ভাবে আত্ম-উন্নতি ঘটে না, আত্ম-উন্নতি ঘটে ব্যক্তিগত চেষ্টা, শ্রম আর সংযমের পথে। তাঁর নির্দেশিত পঞ্চশীলের সবক'টা শীলই ব্যক্তিগত আচরণীয় ও পালনীয়। প্রাণী হত্যা, পরস্বাপহরণ, অবৈধ যৌন সম্ভোগ না করা, মিথ্যা, পরনিন্দা কিম্বা রূঢ় কথা না বলা, মদ আর নেশা বস্তু গ্রহণ না করা—ব্যক্তিগত জীবনে সংযম আর ত্যাগ ছাড়া এসব

হওয়ার নয়। আনুষ্ঠানিক উপাসনা আর প্রার্থনার সাহায্যে এসব আয়ত্ত হতে পারে না কিছুতেই।

বুদ্ধের এসব নির্দেশ পালন খুব কঠিন বটে কিন্তু এতে কোন রকম জটিলতা কিংবা দুর্জ্ঞেয়তা নেই, এ অত্যন্ত সরল ও সহজবোধ্য। রহস্য ঘেরা দার্শনিক জটিলতাকে বুদ্ধ কোনদিন দেননি প্রশ্রয়। যেমন অনেক ধর্মের কোন কোন জিজ্ঞাসু প্রশ্ন তোলেন: মানুষ কে, কি? কোথা থেকে এসেছে? কোথায় যাবে? এধরনের অর্থহীন তথা উত্তর-বিহীন প্রশ্নকে বুদ্ধ কখনো আমল দেননি। এসব প্রশ্ন মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে কিন্তু পারে না তাকে সৎজীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে। বুদ্ধের তাবৎ শিক্ষার মূল লক্ষ্য সৎ-মানুষ, সৎ-জীবন। চেষ্টা আর উদ্যমের ফলে ক্রমাগতই মানুষের ধ্যান-ধারণা ও মানস-জীবনে বিবর্তন ঘটে চলেছে। প্রাচীন বহু বিশ্বাস আর সংস্কার ত্যাগ করে মানুষ এখন অধিকতর আত্মবিকাশ ও আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রগামী। একদিন মানুষ জল-বাতাস অগ্নি আর চন্দ্র-সূর্যকে, এমনকি বজ্র আর মেঘগর্জনকেও দেবতা মানতো। কিন্তু এখন মানে না কেন? কারণ এখন মানুষের বোধ আর বোধি অনেক বেড়েছে, কালের সঙ্গে সঙ্গে তার মানস-জীবন হয়েছে অনেক উন্নত। বুদ্ধের শিক্ষা আর নির্দেশ জীবনে গৃহীত হলে মানুষের আরো যে আত্মবিকাশ ঘটবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নির্মাতা। এও বুদ্ধের এক অবিনশ্বর বাণী। এভাবে অতি প্রাকৃত ও পরনির্ভরতার গ্লানি থেকে তিনি মানুষকে দিয়েছেন মুক্তি।

কথা আছে: মানুষ প্রবৃত্তির দাস। এ দাসত্ব থেকে মুক্তি ছাড়া মানুষ কখনো পরিপূর্ণ বোধ আর বোধিতে পৌঁছতে পারে না। এক-মাত্র আত্মশুদ্ধির পথেই এ দাসত্ব থেকে মুক্তি সম্ভব—সে পথের নির্দেশ রয়েছে, বুদ্ধ-জীবনে, বুদ্ধের শিক্ষা আর বিধি-বিধানে, আদেশ আর নিষেধে।

মানুষ এখন শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে অনেক সভ্য হয়েছে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথে এগিয়ে গেছে অনেক দূরে। তবুও পৃথিবীতে কোথাও শান্তি নেই। সংকটে, সংঘর্ষে পৃথিবী আজ জর্জরিত। যুদ্ধ-বিগ্রহে আর এসব মারামারি, খুনোখুনিতে যে হারছে তার যেমন শান্তি নেই তেমনি শান্তি নেই জয়ী হচ্ছে তারও। ব্যক্তির বেলায় যেমন এ সত্য তেমনি দেশ ও জাতির বেলায়ও এ একবিন্দু মিথ্যা নয়। বুদ্ধ-শিষ্য

অশোক জীবনের এ মহাসত্য দু'হাজার বছর আগে বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর মন্ত্র-গুরু বুদ্ধের জীবনাদর্শ আর শিক্ষার আলোয়। তাই বিজয়ী হয়েও জয়ের ফল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি ত্যাগ আর অহিংসার জীবনকে নিয়েছিলেন বরণ করে। এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ। বুদ্ধ-জীবন মানুষের কাছে এক অবিনশ্বর আলোক-বর্তিকা—এ আলোক-বর্তিকা একদিন সম্রাট অশোককে যেমন সত্য মনুষ্যত্ব আর শান্তিব পথ দেখিয়েছিল, আজকের দিনেও সে পথ দেখতে তা সক্ষম যদি মানুষ সশ্রদ্ধ চিত্তে এ আলোক-বর্তিকার দিকে নতুন করে ফিবে তাকায় আর বরণ করে নেয় তাঁকে সর্বান্তঃকরণে।

বুদ্ধ আর বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে আমাদেব অর্থাৎ অ-বৌদ্ধদের মনে একটা রহস্য-ঘন বিস্ময় রয়েছে। এ বিস্ময়ের বড় কারণ অপরিচয়। বৌদ্ধ-বিশ্বাস আর ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে যাঁরা জন্মাননি তাঁদের কাছে বুদ্ধ-জীবন আর বৌদ্ধ-ধর্ম সম্বন্ধীয় অনেক কিছুই দুর্জ্ঞেয়—বিরাট বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্রের মহাসমুদ্র মন্থনের যোগ্যতা, ধৈর্য আর নিষ্ঠা আমাদের অনেকেরই নেই। ফলে যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি থেকেও পরস্পরের ধর্ম ও ধর্মাচরণ সম্বন্ধে আমরা থেকে যাই অজ্ঞ। অজ্ঞতাই জন্ম দেয় বহু অবিশ্বাস আর সংশয়-সন্দেহেব—যা কালক্রমে ঘৃণা বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব-বিরোধের আর নানা অশুভ ক্রিয়া কর্মের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ধর্ম বিশ্বাস ও চেতনা মানুষের গভীরতম সত্তার সঙ্গে জড়িত—তাই কোন মানুষকে ব্যক্তি কিম্বা সংগতভাবে জানতে হলে তার এ সত্তার সঙ্গেও পরিচয় অত্যাবশ্যক। সে পরিচয়ের কোন ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষা-জীবনের কোন স্তরে যেমন নেই তেমনি আমাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভংগিও তার অনুকূল নয়। এর ফলে আমাদের জ্ঞান যে শুধু খণ্ডিত থেকে যায় তা নয়, একটা সুসংহত জাতি কিম্বা সমাজসত্তা গড়ে ওঠার পথেও আমাদের দেশে এ হয়ে আছে এক দুরতিক্রম্য বাধা। অন্ততঃ জ্ঞানের ক্ষেত্রে এ বিচ্ছিন্ন মনোভাবের আশু অবসান হওয়া উচিত। জ্ঞানের ক্ষেত্রে জাত্যভিমান তথা ধর্মীয় গোঁড়ামি অত্যন্ত ক্ষতিকর। আমার বিশ্বাস আমাদের দেশের সব ধর্মাবলম্বীরাই এ অপরাধে অপরাধী।

মহামানব বুদ্ধের মনোরম জীবন আর তাঁর শিক্ষা আমাকে আকর্ষণ করে তাঁর মানবিকতার জন্য। মানবচরিত্রের অতলে ডুব দিয়ে তিনি একদিকে খুঁজে বের করেছেন তার ক্লেদ গ্লানি দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা,

ইত্যাদি, অন্যদিকে আবিষ্কার করেছেন তাতে অসীম শক্তি আর অনন্ত সম্ভাবনার বীজ—যা অঙ্কুরিত হয়ে রূপ নিতে সক্ষম 'প্রজ্ঞা পরিপারমিতায়' অর্থাৎ পূর্ণ বিজ্ঞতায়। মানবিক শত বন্ধনে মানুষ বাঁধা। যা সর্ব দুঃখ-কষ্ট আর শোক-সন্তাপের উৎস—এ বন্ধন-মুক্তির উপায় ও পথ বাৎলিয়েছেন বুদ্ধ। ইংরেজীতে একটি কথা আছে, যার অর্থ : মানুষকে অধ্যয়ন করেই জানতে হয় মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্বকে জানার প্রধানতম উপায় মানুষকে জানা, মানুষকে অধ্যয়ন করা। মহাপুরুষ বুদ্ধ তাই করেছেন। মানুষকে অধ্যয়ন করেই তিনি জেনেছেন মানুষের মুক্তির নিদান। প্রজ্ঞার বিদ্যুৎঝলক যে তাঁর মনে সর্বপ্রথম ঝলকে উঠেছিল সেও তো পীড়িত, জরাগ্রস্ত আর মৃত মানুষকে দেখেই। যার ফলে মুহূর্তে শুধু যে তাঁর ব্যক্তি-জীবনে রূপান্তর ঘটে গেল তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে উদ্ঘাটিত হলো তাঁর অন্তর্লোকে সত্যের, করুণার আর প্রেমের এমন এক সূর্য-করোজ্জ্বল দীপ্তি যার কোন তুলনা হয় না। এ মহা সত্যের পথ ধরেই শুরু হলো তার সাধনা—সে সাধনার লক্ষ্য মানুষ আর মানুষের অন্তর্জীবন, তার রহস্য সন্ধান। সে সন্ধানে তিনি সফল হয়েছেন। হয়েছেন 'জিন' বা জয়ী। মানব সভ্যতার সূচনার যুগে এ সত্যই এক বিস্ময়কর ঘটনা। এক রাজপুত্র, সুন্দরী স্ত্রী আর সদ্যোজাত সন্তানকে জীবনের জন্য ছেড়ে সত্যের ও মানব মুক্তির সন্ধানে গৃহ-ত্যাগ করে এক দুঃসহ বনজীবন বরণ করে নিয়েছেন মানুষের জন্য এ তো এক অত্যাশ্চর্য শিহরণ! হয়তো মহাপুরুষদের জীবন এমনি অকল্পনীয়, অচিন্তনীয়ই হয়ে থাকে। না হয় তাঁরা মহাপুরুষ হলেন কি করে?

বুদ্ধ-জীবনের মতো ত্যাগ-সাধনা আর মনুষ্যত্বোপলব্ধির এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে সত্যই বিরল।

বুদ্ধের শিক্ষার চরমতম লক্ষ্য নির্বাণ। মানুষ ইন্দ্রিয়ের দাস—এ দাসত্বের চেয়ে হীনতম দাসত্ব আর নেই। এ বন্ধন মোচনের বাণীই তিনি শুনিয়েছেন মানুষকে। এ ছাড়া ভব-যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি নেই। ভব-যন্ত্রণার হাত থেকে চির-মুক্তিরই এক নাম নির্বাণ। 'বিশ্বাসে মিলায় স্বর্গ'—এমন আপ্তবাক্যে বুদ্ধ বিশ্বাস করেন না। কর্ম-বিহীন বিশ্বাস ত স্রেফ নিষ্ক্রিয়তা, এতে প্রশ্রয় পায় জড়তা আর শ্রম-বিমুখতা। বুদ্ধের শিক্ষা আর ধর্মের মর্ম কথাই হলো—অবিরত আর অবিচলিত চেষ্টা। তিনি নিন্দা করেছেন অজ্ঞতা, লোভ আর হিংসা বিদ্বেষকে। অন্তরের অন্তস্তল থেকে এ সবকে

জড়শুদ্ধ উৎপাটিত করার দিয়েছেন নির্দেশ। শুধু বিশ্বাস বা উপাস্য কিম্বা আরাধ্যের নাম জপ করলে এ হওয়ার নয়। তাই বিশ্বাস কি উপাসনার উপর তিনি মোটেও জোর দেননি। কারণ ঐসবের মধ্যে ব্যক্তির কোন প্রচেষ্টা নেই, নিজেকে রূপান্তরিত করার নেই কোন প্রয়াস। মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে, গড়ে তোলে তার চিন্তা, তার কথা তার কর্ম। জড় অভ্যাস নয়। তাই মানুষ বিশ্বাসে তোতাপাখী হোক বুদ্ধ এ কখনো চাননি। মানুষ সক্রিয় হোক। প্রয়াসী আর উদ্যোগী হোক এ তিনি চেয়েছেন, দিয়েছেন তেমন বিধান। সন্ন্যাস এসবের বিপরীত, সন্ন্যাসও এক রকম জড়তা, তাই কৃচ্ছ সন্ন্যাস জীবনকেও তিনি করেছেন নিন্দা। সন্ন্যাস আত্মরতির প্রশ্রয় দিয়ে থাকে, মানুষের অন্তরে জাগিয়ে তোলে অহংবোধ। এসবের অসারতা বুদ্ধ বুঝতে পেরেছিলেন—তাই বলেছেন অকারণ শারীরিক কষ্ট ভোগ কখনো মুক্তির পথ নয়। নয় শান্তি কিম্বা প্রজ্ঞার পথ।

মানব মনের উন্মেষ আর বিকাশ যেখানেই ঘটেছে, তা সবই চেষ্টা, জিজ্ঞাসা আর সন্ধানের পথেই হয়েছে, তারই ফল এসব। স্রেফ উপাসনার দ্বারা এসবের কিছুই হয়নি—এযাবত মানব সভ্যতার যা কিছু উন্নতি, তা সবই কর্ম, জিজ্ঞাসা আর সন্ধানেরই ফলশ্রুতি। বুদ্ধের নিজের জীবনও ছিল তাই। এ পথেই তিনি মানব-মুক্তির মহা সনদ খুঁজে পেয়েছেন। পৃথিবীতে প্রাণের চেয়ে দুর্লভ সম্পদ আর নেই—তাই প্রাণ হননের বিরুদ্ধে কঠোরতম নিষেধ তাঁর কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছে সর্বাগ্রে। তিনি যে শুধু অহিংসা মন্ত্রই পৃথিবীকে শুনিয়েছেন তা নয়, সে সঙ্গে শুনিয়েছেন কর্ম উদ্যমের বাণীও। ধর্ম প্রবর্তকের মধ্যে সম্ভবতঃ একমাত্র তিনিই এমন দুঃসাহসিক কথা বলেছেন : Prayer is useless, for what is required is effort. The time spent on prayer is lost and the time spent no effort to achieve something is not lost. অর্থাৎ স্রেফ উপাসনায় যে সময় ব্যয় করা হয় তা নিষ্ফল কিন্তু কোন কিছু উপার্জনের প্রচেষ্টায় যে সময় ব্যয় করা হয় তা-ই ফলপ্রসূ।

এ মহামানব সব রকম সংস্কারের বিরোধী ছিলেন। তাই মানুষের প্রতি তাঁর উদাত্ত আহ্বান : 'দূর করো পুরোণো সংস্কারকে, বরণ করে নাও নতুনকে, পরিহার করো পাপ, শ্রেয়কে করো সঞ্চয়। সব রকম পাপ আর বাসনা কামনার বিরুদ্ধে করো বীর বিক্রমে সংগ্রাম।' বৌদ্ধ-অ-বৌদ্ধ সকলের দৃষ্টি এ মহৎ বাণীর প্রতি আবার নতুন করে আকৃষ্ট হোক।

মহামানব বুদ্ধ

এক কালে ধর্মই মানুষের জীবনের সব কিছু নিয়ন্ত্র। করতো—এখন সে দায়িত্ব অনেকখানি রাষ্ট্র, সমাজ আর বিজ্ঞান গ্রহণ করেছে। সব ধর্মকেই আজ এ ত্রয়ীর মোকাবেলা করতে হচ্ছে—এ মোকাবেলায় যে ধর্ম টিকে থাকতে পারবে না তার অস্তিত্ব বিপন্ন হবেই, তার আবেদন ব্যর্থ না হয়ে পারে না। বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বাস্তব চেতনা আর ঐহিক বোধ অনেক বেড়ে গেছে—শুধু পারলৌকিক ভালমন্দের আবেদনে আজ মানুষের মন কিছুমাত্র সাড়া দেয় না। যে জীবনটা তার হাতের মুঠোয়, ওটার হিতাহিত নিয়েই তার এখন ভাবনা—কঠিন বাস্তব তাকে আর দিচ্ছে না আকাশচারী হতে। পরলোকের মুক্তির কথা ভেবে মানুষ আজ মোটেও বিচলিত নয়—এখন মানুষ মুক্তি চায় ইহলোকের দুঃখ দুর্গতি আর অভাব-অনটনের কবল থেকে। আজ মানুষ মানুষকে যতখানি ভয় করছে তার সিকির সিকিও ভয় করছে না ঈশ্বরকে কিম্বা ঈশ্বরের দণ্ডকে। তাই পরলোকের ভয়ভীতি ও প্রলোভন আজ মানুষের জীবনে অনেকখানি অবান্তর। এ কারণে ধর্মের প্রতিও আজ নতুন দৃষ্টিতে তাকাতে হবে—ধর্মকেও আজ বিচার করতে হবে ঐহিক মাপকাঠি দিয়ে।

বুদ্ধের জীবন আর শিক্ষা পুরোপুরি ঐহিক ভিত্তিক বলে এ মাপকাঠি দিয়ে তার মূল্যায়ন অধিকতর সহজ—এর ফলাফল চাক্ষুষ আর প্রত্যক্ষ। বুদ্ধ নিজেও কাল্পনিক ফলশ্রুতির উপর নির্ভর করেন নি। তেমন উপদেশ তিনি দেননিও। প্রতিদিন বাস্তব জীবনে যে সব সমস্যায় মানুষের অস্তিত্ব জর্জরিত তার অপনোদনের পথ আর উপায়-ই তিনি নির্দেশ করেছেন। আর তা কিছুমাত্র সাধ্যাতীত নয় মানুষের। কোন রকম অলৌকিক শক্তির দোহাই বুদ্ধ দেননি—জানাননি তেমন কিছুর প্রতি

স্বীকৃতিও। সর্বতোকারে এ জীবনকেই তিনি গ্রহণ করেছেন এর বৃত্ত ছাড়িয়ে যাবার কোন প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি। এ প্রত্যক্ষ জীবনকে ডিঙিয়ে অন্য কোন অপ্রত্যক্ষ জীবনের স্বপ্ন তাঁর কল্পনায় পায়নি স্থান। তাঁর শিক্ষা, তাঁর ধর্ম ও তাঁর আবেদন এ জীবনের জন্যই। সমস্ত অবৈধ বাসনা-কামনার কবল থেকে মুক্ত করে এ জীবনকেই চেয়েছেন তিনি সুন্দর আর সুস্থ করে গড়ে তুলতে।

মানুষের অন্তরেই মানুষের সব দুঃখের বীজ নিহিত—এ মহাসত্যের তিনি আবিষ্কর্তা। আর তার মূল উৎপাটনই তার সব শিক্ষার মূল লক্ষ্য। পরলোকে স্বর্গ-নরক থাকলেও এ জীবনে তার কোন মূল্য নেই —কাজেই তার কথা ভেবে শঙ্কিত বা উচ্ছ্বসিত হওয়া বা তার উপর জোর দেওয়ার কোন মানে হয় না। তাই সে সম্বন্ধে মহামানব বুদ্ধ মোটেও মাথা ঘামাননি। তিনি মানুষ, রক্তমাংসের মানুষ। তাঁর সব চিন্তা-ভাবনা ও মানুষের জীবন-পরিধিতেই সীমিত। মানুষের এ জীবনের কল্যাণ আর এ জীবনের মুক্তিই তিনি চেয়েছেন—এ উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করেছেন তার জীবন আর জীবনের সব কিছু। সিদ্ধি খুঁজেছেন এ জীবনের পরিমণ্ডলেই।

অন্য সব ধর্মেই ঈশ্বর, আল্লাহ, গড্, ভগবান, দেবতা ইত্যাদি এক বড় স্থান জুড়ে রয়েছে, আর রয়েছে পরলোকের সম্ভাব্য জীবন। একমাত্র বুদ্ধের শিক্ষায় মানুষই বড় আর একমাত্র হয়েই দেখা দিয়েছে। সে-মানুষ সমাজ, রাষ্ট্র আর বিজ্ঞানের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। অলৌকিকতা এ জীবনে হালে পানি পায় না। তাই বোধকরি বুদ্ধের শিক্ষা আর আবেদনে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ধর্মই একমাত্র ধর্ম যা মানুষের তৈয়ারী আর সর্বতোভাবে তা মানুষের জন্যই এবং মানুষকে নিয়েই। এদিক দিয়ে একে মানব ধর্মই বলা যায় আর এ ধর্মের প্রবর্তককে সত্যার্থেই বলা যায় মহামানব। মহামানব বুদ্ধের জয় হোক। জয় হোক তাঁর অহিংসামন্ত্রের আর জীবন-চেতনার।

সাহিত্য ও সাহিত্য-পুরস্কার

॥ ১ ॥

সত্য ও বিবেকেব সাধনা আব অকুতোভয়ে তাব উপলব্ধিকে ভাষাদান— মোটামুটি সাহিত্যেব এ স্বভাব ও ধর্ম। সৌন্দর্য আব বহির্ভূত নয়। এপথ অত্যন্ত দুরূহ আব এব হা এমন বিবাট যে এ-ব্যক্তিব সর্ব-সত্তাকে গ্রাস কবে নেয়। কিন্তু ভাগ্যেব অমোঘ বিধান, এপথেব পথিক আব সাধকরাও স্থূল তথা ব্যবহারিক জীবনেব শর্তাধীন। অমরতাব সাধনায় আত্মনিমগ্ন থাকলেও এব-জীবনেব সব দাবিব শিকলে তাবাও আষ্টেপিষ্ঠে বাঁধা। চবম সত্যটি অতি প্রাচীনকাল থেকেই, পথেব পথিকদেব যেমন জানা ছিল তেমনি জানা ছিল দেশ, সমাজ আব রাষ্ট্র আব শাসকদেবও। শেষোক্তদেব দেশ কালভেদে নানা পবিচয়, যেমন নবাব-আমীব, রাজা-বাদশাহ, আমীব-সোলতান, জমিদাব-ভূস্বামী ইত্যাদি। এরা ব্যক্তিগত আব বংশগত স্বার্থে কিংবা নিজেদেব খেয়ালখুশীতে নানা আমোদে-প্রমোদে বিচিত্র বিলাস-ব্যসনে প্রজাব বক্তজল কবা অজস্র অর্থ যে ব্যয় করতো না তা নয়। কিন্তু প্রশংসাব কথা, এবাও, সত্য ও বিবেকের চর্চার তথা সাহিত্য ও শিল্পেব মূল্য দিতো। বিজ্ঞাপন যুগেব বহু আগে, দূর অতীতেও এদেব অনেকে এসবের কদব কবেছে, দিচ্ছে যথাযোগ্য মর্যাদা। অধিকন্তু এসবেব অবিনশ্বব মূল্যবোধে তাবা ন্যস্ত কবেছে অসীম বিশ্বাস ও আস্থা। তাই এসব সাধকদেব অর্থাৎ কবি শিল্পী, সাহিত্যিক গায়ক ও গুণীদের আশ্রয় দিতে, পৃষ্ঠপোষকতা করতে এদেব অনেকে সাগ্রহে এসেছে এগিয়ে। সব দেশে, সব যুগে এ দেখা গেছে। ফলে প্রাত্যহিক জীবনে ও আবিশ্যক দাবি-দাওযার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে এসব গুণী আর সাধকরা সর্ব-সত্তা দিয়ে নিজ নিজ প্রতিভাব দায়-শোধ আর দায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ কবতে পেরেছেন। এবং অনেকটা ঐ কারণেই তেমন

আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতা তাঁরা যে শুধু মেনে নিয়েছেন তা নয়, অনেক সময় যেচেও নিয়েছেন। আর তা যে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে সেদার নজির সাহিত্য শিল্পের ইতিহাসে ছড়িয়ে আছে। বিক্রমাদিত্যের 'নবরত্ন' আর আকবরের 'নওরতন' সভার কথা সর্বজনবিদিত। আমার বিশ্বাস, তেমন পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে 'মেঘদূত' আর 'শকুন্তলার' মতো অমর কাব্য আদৌ রচিত হতো কি না সন্দেহ। সে কথা 'শাহনামা' সম্বন্ধেও বলা যায়। আমার বিশ্বাস বহুনিন্দিত সোলতান মাহমুদের নির্দেশ আর পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া 'শাহনামার' মতো অত বড় মহাকাব্য আদৌ রচিত হতো একথা জোর করে বলা যায় না। পরে সোলতানের সঙ্গে কবির যে বিরোধ তথা ষাট হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রত্যাখ্যানের যে কাহিনী তার কারণ ত সোলতানের সত্যভঙ্গ। এসত্য ভঙ্গ কথাটি সাহিত্য শিল্পের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর মূল্যবান। সত্য আর বিবেকের সাধক যাঁরা তাঁরা সবকিছু সহ্য করতে রাজি কিন্তু সত্যভঙ্গ বরদাস্ত করতে রাজি নন কিছুতেই। এমন কি বিরাট অঙ্কের অর্থ আর পৃষ্ঠপোষকতার বিনিময়েও না।

য়ুরোপের বিবেক নামে অভিহিত মহাকবি গ্যাটে ভাইমার সামন্তরাজের অনুগ্রহভাজন ছিলেন। জীবনের শেষ কাল পর্যন্ত মন্ত্রীত্ব করেছেন ঐ সামন্তের অধীনে। কিন্তু বিবেক বিক্রয় করেন নি বরং আজো বিশ্বের বুদ্ধজীবীদের সামনে বিবেকের এক অনির্বাণ দীপশিখা হয়েই বিরাজ করছেন তিনি। নদীয়ায়ার কৃষ্ণচন্দ্রও ছিলেন এক সামন্ত-রাজ, তাঁর সভাকবি ভারতচন্দ্রের কাব্যসাধনায় তা কোন বাধার সৃষ্টি করেছিল বলে জানা যায়নি। আলাওলের সুবিখ্যাত 'পদ্মাবতী'ও রচিত হয়েছে আরাকান-রাজের অমাত্যের আশ্রয়ে ও পৃষ্ঠপোষকতায়। বলা বাহুল্য, আরাকান রাজসভার সব কবিই ছিলেন 'আশ্রিত' ও 'পোষিত'। বাংলা সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' যে ত্রিপুরার মহারাজার অর্থানুকূল্যেই প্রকাশিত হয়েছিল সে কথা তো দীনেশ চন্দ্র নিজে বলে গেছেন। ঐ গ্রন্থের জন্যই লর্ড কার্জনের মতো ভারত বিরোধী জাঁদরেল বড়লাটও দীনেশ চন্দ্র সেনের জন্য মাসিক পঁচিশ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করেছিলেন। দীনেশ সেন সকৃতজ্ঞ চিত্তে এসব কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায়। তাঁর রায়বাহাদুর খেতাবও তাঁর সাহিত্য সাধনারই পুরস্কার। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ত্রিপুরার মহারাজার কাছ থেকে নানা উপলক্ষে একাধিকবার অর্থ সাহায্য নিয়েছেন। এমন কি ইংরেজের বশংবদ আর

সে যুগের সেরা সামন্ত হায়দ্রাবাদের নিজামের কাছ থেকেও টাকা নিতে দ্বিধা করেননি এ মহাকবি। বলা বাহুল্য সে টাকার পরিমাণ বেশ মোটা। রবীন্দ্র-জীবনীর পাঠকদের কাছে এসব অজানা নয়। লালগোলার মহারাজ ও অন্যান্য বহু ধনাঢ্যের অর্থেই গড়ে উঠেছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ—যে সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বহু মূল্যবান গ্রন্থ শুধু প্রকাশিত হয় নি, সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণার সুযোগও দিয়েছে অনেক গবেষককে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু নিবেদিত-প্রাণ সাহিত্য কর্মীর কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এমন কি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আনুকূল্য ছাড়া আমাদের সাহিত্যবিশারদ আব্দুল করিমের 'গোরক্ষ বিজয়', 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' প্রভৃতি মূল্যবান গ্রন্থও প্রকাশিত হতো কি না সন্দেহ। মাত্র সেদিন মহাকবি গালিবের মৃত্যুবার্ষিকী পাকিস্তানেও পালিত হয়েছে—গালিব শুধু যে শেষ মোগল সম্রাট আর রামপুরের নবাবের কাছ থেকে বৃত্তি পেতেন ও নিতেন তা নয়, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছেও পৈত্রিক জায়গীর আর নিজের জন্য একটা পেনশনের দাবি জানিয়ে তিনি আর্জি পেশ করেছিলেন একাধিকবার। দুঃখের বিষয় তাঁর আর্জি মঞ্জুর হয় নি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকবি মধুসূদন, পাইকপাড়ার জমিদারের থেকে অর্থ নিয়ে নাটক লিখে দিয়েছেন—মধুসূদনের জীবনী আর বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে এ সব তথ্য অজানা থাকার কথা নয়। মোট কথা সাহিত্য-পুরস্কার, সাহিত্য-বৃত্তি বা কবি সাহিত্যকদের সাহায্য দেওয়া নেওয়া সব সভ্য সমাজে এক পুরোনো রেওয়াজ, নতুন কিছু নয় মোটেও। লেখকদের জন্য সবচেয়ে বড় কথা বিবেক ও মনের স্বাধীনতা। এ দুই বজায় রেখে মহাপ্রতিভারাও বিত্তশালীদের কাছ থেকে সাহায্য নিতে কখনো দ্বিধা করেন নি।

কালের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র, সমাজ আর সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো ইত্যাদি সব কিছুই দ্রুত বদলে যাচ্ছে, বদলে গেছে। বহু দেশ থেকে রাজা-বাদশাহ, নবাব-আমীর, জমিদার-ভূস্বামী এখন নিশ্চিহ্ন। পাকিস্তানও তার ব্যতিক্রম নয়। এখন রাজ-রাজড়া কিংবা ধনী ও বিত্তশালীদের স্থান দিয়েছে শিল্প আর পুঁজিপতিরাই, ইতিহাসের এ এক স্বাভাবিক ধারা। এ ধারা অনুসরণ না করলে সাহিত্য-পুরস্কার সম্বন্ধেও বিভ্রান্তি ঘটার সম্ভাবনা। সম্প্রতি আমাদের কোন কোন সহকর্মী তেমন বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন বলেই এ লেখার সূত্রপাত। আমাদের সমাজ যে পুরোপুরি পুঁজিবাদী তাতে

বোধ করি দ্বিমত নেই। পুঁজিবাদের একটা স্বাভাবিক অনুষঙ্গ, পুঁজি সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পুঁজিপতিরাও কিছু কিছু সৎ কর্ম ও জনহিতকর কাজ করতে বাধ্য হন। অনেক সময় অবস্থা এ করতে তাঁদের বাধ্য করে। যেমন স্কুল-কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা, বিভিন্ন বিষয়ে চাঁদা আর বৃত্তি দেওয়া ইত্যাদি। সাহিত্য-পুরস্কারও এ কর্মসূচীর অন্তর্গত। পৃথিবীর তাবৎ পুঁজিবাদী দেশে এর বিস্তর নজির রয়েছে। সুবিখ্যাত 'ফোর্ড ফাউণ্ডেশন' তেমন একটি সুপরিচিত নজির—যার থেকে আমাদের দেশের অনেক গবেষক শিক্ষার্থী, জ্ঞানী-গুণীও উপকৃত হয়েছেন। তাব ফলে কেউই ফোর্ড কোম্পানী বা ফোর্ড পরিবারের 'চরণাশ্রিত' হয়েছেন কিংবা 'আত্মবিক্রয়' করেছেন তেমন কথা শোনা যায়নি। দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা সাহিত্য-পুবস্কার বোধ করি 'নোবেল প্রাইজ'। এ কি কোন নিঃস্ব বা পুঁজিহীনের দান? আলফ্রেড নোবেলের পরিচয় প্রসঙ্গে, হাতেব কাছে যে বিশ্বকোষটা আছে তাতে লেখা হয়েছে, ...The inventor of Dynamite was a Swedish engineer and chemist who amassed a large fortune from the manufacture of explosives (Pear's Encyclopaedia) অর্থাৎ সর্বধ্বংসী ডিনামাইট থেকে নানা বিস্ফোরণ তৈরী করে পৃথিবীর বড় বড় যুদ্ধবাজ দেশগুলোর কাছে তা চড়া দামে বিক্রি করে নোবেল প্রভূত ধনের মালিক হয়েছিলেন। সে সঞ্চিত অর্থেব একটা মাত্র অংশ থেকেই সব ক'টা নোবেল প্রাইজের জন্ম। ডিনামাইটের ভূমিকা কারো অজানা নয়। তার থেকে প্রস্তুত বিস্ফোরণ দু'দুটা প্রলয়ঙ্করী মহাযুদ্ধে, আরো উন্নততর অস্ত্রে রূপান্তরিত হয়ে মানুষ আর মানব-সভ্যতার বিরুদ্ধে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তা বোধ করি বলার প্রয়োজন নেই। ডিনামাইট থেকে তৈরী নানা বিস্ফোরণ এখনো কি ভিয়েৎনাম আর মধ্যপ্রাচ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে না? আর তার ধ্বংসেব চিত্র প্রতিনিয়তই তো প্রকাশিত হচ্ছে সংবাদ-পত্রে। তবুও চিরযুদ্ধ-বিরোধী রোমা রোঁলা, রাসেল, টমাসম্যান, রবীন্দ্রনাথ এমনকি শান্তির শহীদ মার্টিন কিং পর্যন্ত ঐ প্রাইজ গ্রহণকে অপমানজনক মনে করেন নি। কিংবা ঐ প্রাইজ থেকে নোবেলের নামের চিহ্ন মুছে ফেলার অদ্ভুত দাবিও জানাননি। পুঁজিবাদের পরমশত্রু আর শ্রেণীহীন সমাজতন্ত্র যে দেশে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত, সে দেশের সাহিত্যিক আর বৈজ্ঞানিকরাও নোবেল প্রাইজ নিতে অস্বীকার করেননি। বরিস প্যাস্টারনেকও নিতে

রাজি ছিলেন এমনকি নোবেল প্রাইজ কমিটিকে তিনি ধন্যবাদও জানিয়েছিলেন। পরে যে নিতে পারেননি সে তো তাঁর দেশের সরকারের আপত্তির জন্যই। আর সবাই জানেন সে আপত্তি ছিল রাজনৈতিক। আলফ্রেড নোবেলের 'নাম-চিহ্নিত' বলে মোটেও নয়। যাঁরা ঐ পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছেন তাঁরাও করেছেন ভিন্নতর কারণে—নোবেলের 'নাম-চিহ্ন' অজুহাতে নয়। সাহিত্য আর পুরস্কাব সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। যাঁরা বিভিন্ন সাহিত্যে পুরস্কার পেয়েছেন, দুনিয়ায় কোন রকম সাহিত্য-পুরস্কার না থাকলেও তাঁরা সাহিত্য করতেন—পুরস্কার পাওয়ার পরেও সাহিত্য করেছেন ও করে চলেছেন নিজেদের বিবেক আর সত্যকে বজায় রেখে। পুরস্কার পাওয়ার পর কারো মতাদর্শেব রাতারাতি রদবদল ঘটেছে তেমন ঘটনা আমার জানা নেই। গোড়াতেই বলেছি সাহিত্য মানে সত্য ও বিবেকের চর্চা—কোন সাহিত্য-পুরস্কারই খাঁটি সাহিত্যিককে সাহিত্যের চিরকালীন ভূমিকা থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। অতীতে যাঁরা রাজা-বাদশাহ কিম্বা জমিদার ভূস্বামীদের আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতায় থেকে সাহিত্য করেছেন তাঁদের বেলায় যেমন এ কথা সত্য, এ যুগের সাহিত্যিকদের বেলায়ও এ বিন্দুমাত্র মিথ্যা নয়। সীমিত অর্থে আমাদের দেশের খাঁটি কবি আর সাহিত্যিকরাও এ পূর্বসূরীদেরই উত্তর-সাধক।

যত ভয় মেকিদের আর মেকিদের নিয়েই। তাঁরাই রজ্জুকে সর্প মনে করে আঁৎকে ওঠেন!

॥ ২ ॥

অতীতকালে যা ছিল আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতা বা মাশোওয়ারা, বলা বাহুল্য এখন তা' নাম নিয়েছে সাহিত্য-পুরস্কার, সাহিত্য ভাতা, সাহিত্য-বৃত্তি ইত্যাদি। সে যুগে কোন কোন ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যদাতার প্রশস্তি গাইতে হতো, (এমন কি দীওয়ানে গালিবেও তার নিদর্শনে অভাব নেই) এখন একটা সালাম ঠোকারও প্রয়োজন হয় না, পুরস্কারের অর্থ-দাতাদের মন যুগিয়ে চলা বা কথা বলা ত দূরের কথা। ক্রমবর্ধমান গণতান্ত্রিক চেতনা আর সমাজ বিবর্তনেরই যে এ অনিবার্য পরিণতি তাতে বোধ করি সন্দেহ নেই। আমাদের দেশে যে ক'টা পুঁজিপতি নামাঙ্কিত সাহিত্য-পুরস্কার চালু হয়েছে প্রশংসার কথা তাতেও কোন শর্ত আরোপিত হয়নি।

এসব পুরস্কার গ্রহণে যাঁদের আপত্তি তাঁরা কি রকম সমাজ বা সমাজ ব্যবস্থা চান জানি না, পুঁজিবাদহীন সমাজতন্ত্র যে তাঁরা চান তার অস্পষ্ট চেহারাও তাঁদের রচনায় দুনিরীক্ষ্য। তবে তাঁদের সাম্প্রতিক বিবৃতি আর পত্র পত্রিকায় চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে তাঁরা পুঁজিপতিদের উপর খাপ্পা! বিস্ময়ের বিষয় এটুকু যে খাপ্পা হলেও প্রয়োজনের সময় পুঁজিপতিদের কাছ থেকে এটা ওটার অজুহাতে টাকা নিতে বা তাঁদের অধীনে নৌকরি করতে এঁদের বিবেকে মোটেও বাধে না। কিছুদিন আগে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে চট্টগ্রামে যে সাহিত্য-সভা হয়েছিল, শুনেছি তার জন্য টাকা তোলা হয়েছে পুঁজিপতি আর ব্যাঙ্ক ইত্যাদি পুঁজিপতি চালিত সংস্থা থেকেই। যিনি সর্বপ্রথম পুঁজি-পতি নামাঙ্কিত সাহিত্য-পুরস্কারের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছেন, শুনলামই তাঁরই স্বাক্ষরিত আবেদন-পত্র নিয়েই তাঁর প্রতিনিধিরা পুঁজিপতি আর ব্যাঙ্ক ম্যানেজারদের কাছে অর্থের জন্য হাত পেতেছিলেন। বিজ্ঞাপন ছেপে বা ছাপার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অর্থ নেওয়ার চেয়ে, দীর্ঘশ্রম আর অসীম অধ্যবসায়ে বই লিখে, দেশের সাহিত্যকে কিছুটা সমৃদ্ধ করে সাহিত্যে পুরস্কার নেওয়া নিন্দনীয় বিবেচিত হওয়ার যুক্তি কোথায়? বিজ্ঞাপনের জন্য পুঁজিপতিদের কাছে ধন্না দিতে হয়, বিজ্ঞাপনে পুঁজিপতিদের কলকার-খানা বা ব্যাঙ্কের গুণপনা (সত্য-মিথ্যা যাই হোক) প্রচার করতে হয়। কিন্তু সাহিত্য-পুরস্কারের বেলায় তেমন কোন বালাই নেই। এমনকি পুরস্কারের অর্থদাতা কিংবা তার ম্যানেজারের মুখ দেখারও হয় না প্রয়োজন। কোন রকম প্রচারণাতো দূরের কথা। বরং এযাবত যে সব বই পুঁজিপতি নাম-চিহ্নিত পুরস্কার পেয়েছে তার কোন কোনটায় পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলা হয়েছে, আঁকা হয়েছে বিরুদ্ধ চিত্রও। বলা বাহুল্য ব্যাঙ্ক কিংবা পুঁজিপতিদের কাছ থেকে বিজ্ঞাপন নেওয়া অথবা চাঁদা কি সাহায্য গ্রহণের আমি বিরোধী নই। আমি শুধু যাঁরা বিজ্ঞাপনের সাহায্যে পুঁজিপতিদের প্রচারণা করে টাকা নেওয়াকে হালাল আর এঁদের দেয় সাহিত্য-পুরস্কার গ্রহণ করাকে হারাম মনে করেন তাঁদের স্ববিরোধিতার প্রতিই পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি। প্রসঙ্গত স্মরণীয়-পুরস্কারের জন্য বই দাখিল করা মোটেও বাধ্যতামূলক নয়। বই দাখিল করা না করা সম্পূর্ণভাবে লেখকের ইচ্ছাধীন। যাঁরা এসব পুরস্কার নেওয়াকে অপমানজনক মনে করেন তাঁরা বই দাখিল না করলেইত পারেন। তা' না করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁদের রয়েছে। যদিও বা কারো অজ্ঞাতে তাঁর বই গায়ে পড়ে কোন হিতৈষী

সাব্‌মিট করে বসেন, সে খবর দীর্ঘকাল লেখকের অজানা থাকার কথা নয়। কারণ সাব্‌মিট করা সব বইয়ের তালিকা 'বই' পত্রিকায় নিয়মিতই প্রকাশিত হয়ে থাকে। তার উপর প্রকাশকের সঙ্গে লেখকের যোগাযোগ থাকে হরহামেশাই। আর পুরস্কার ঘোষিত হয় বই সাব্‌মিটের অন্তত ছ'মাস পরে। কাজেই প্রাইজের জন্য সাব্‌মিট করা বইয়ের তালিকা থেকে নিজের বই তুলে নেওয়া তথা উইথড্র করার যথেষ্ট সময় লেখক পেয়ে থাকেন। সে সময়ের সদ্‌ব্যবহার যদি তিনি নাও করে থাকেন অন্তত পুরস্কার প্রত্যাখ্যানের সময় লেখক সে কথাটা স্বচ্ছন্দে উল্লেখ করতে পারেন এবং সেটা করাই অধিকতর শোভন ও যুক্তিসঙ্গত।

বই দাখিল করে পুরস্কার পাননি এমন কেউ কেউ কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে এমর্মে বিবৃতি দিয়েছেন যে, "সাহিত্য-পুরস্কার গ্রহণ আমাদের কবি-সাহিত্যিকদের পক্ষে কোন সম্মান ও শ্লাঘার বিষয় নয়।" কেন সম্মান ও শ্লাঘার বিষয় নয় তা, তাঁরা দয়া করে ব্যাখ্যা করেন নি। তাঁরা নিজেরাও স্বীকার করেছেন এসব পুরস্কারের সঙ্গে কোন শর্ত নেই। কোন মতবাদ প্রচার বা সমর্থনের দায় নেই লেখকদের বিন্দুমাত্রও। যাঁরা এসব পুরস্কারের অর্থ জোগাচ্ছেন তাঁদের মতাদর্শের বিরুদ্ধ বইয়েরও এসব পুরস্কার পেতে কোন বাধা নেই, বাধা হয়নি এযাবত। লেখার ব্যাপারে লেখকরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। মতাদর্শ নির্বিশেষে যে-কোন সুলিখিত বই এসব পুরস্কার পেয়ে থাকে। এযাবত পেয়েও এসেছে। আমাদের মধ্যে যাঁরা পুঁজিবাদবিরোধী যেমন শওকত ওসমান, শহীদুল্লাহ্‌ কায়সার, শামসুর রহমান, সরদার জয়েন উদ্দীন প্রভৃতি—তারা যেমন এসব পুরস্কার পেয়েছেন, তেমনি যাঁরা ইসলামী ভাবধারা অনুসারী যেমন, বরকতউল্লাহ্‌, আকবর উদ্দীন, ফর্‌রুখ আহমদ প্রভৃতি তাঁরাও পেয়েছেন। এসব পুরস্কার পাওয়ার আগে বা পরে এঁদের কেউই পুঁজিবাদ বা পুঁজিপতিদের কোন রকম প্রচারণায় লিপ্ত হয়েছেন, তেমন কথা আমি অন্তত শুনিনি।

বলা বাহুল্য, ছোট বড় কোন সাহিত্য-পুরস্কারই সহজলভ্য মোয়া নয়। এক একটা বই লিখতে কত বিনিদ্র রজনী কাটাতে হয়, খরচ করতে হয় কতখানি মেদ মগজ তা' খাঁটি লেখক মাত্রেরই জানা। তেমন করে লেখার জন্য যে পুরস্কার আমার মতে তা' লেখকের 'অর্জিত ধন'—তা' পড়ে পাওয়া কিম্বা অনুগ্রহের দান নয়। তা' চাইতে হয় না অনুগ্রহ প্রার্থীর মতো, বা লিখতে হয় না ঐসব পুরস্কারের জন্য বই নেহাৎ বশংবদের মতো। শওকত

ওসমানের 'কাঁকরমণি', 'তস্কর ও লস্কর', 'এতিমখানা' ইত্যাদি ত দারুণ পুঁজিবাদ বিরোধী বই। তাঁর পুরস্কার প্রাপ্ত 'ক্রীতদাসের হাসি'কে ত আইউব শাসনামলের রূপক হিসেবেও নেওয়া যায়। অর্থাৎ নির্যাতনের সাহায্যে কারো মুখে হাসি ফোটানো যায় না এ কথাইত তিনি বলতে চেয়েছেন রূপকের মারফত। ইচ্ছা করলে পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রায় সব বইয়েরই মূল বক্তব্যের সাহায্যে এর কোনটাই যে পুঁজিবাদের সমর্থনে রচিত নয় তা' প্রমাণ করা যায়। বরং অনেক বইতে পুঁজিবাদ বিরোধিতা পেয়েছে প্রকাশ। প্রাগুক্ত বিবৃতিতে এমন কোথাও লেখা হয়েছে "আমাদের কবি সাহিত্যিকগণ দরিদ্র হতে পারেন, কিন্তু আদমজী দাউদ পুরস্কারের অর্থে তাঁরা জীবন ধারণ করবেন বা এই সমস্ত নামকে কবিদের নামের সঙ্গে যুক্ত করে গর্ববোধ কববেন—আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রের এরূপ করুণ ও ধিক্কারজনক অবস্থার যত শীঘ্র পরিসমাপ্তি ঘটে, ততই মঙ্গল।" নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মহৎ ও উচ্চাঙ্গের আবেগ। তবে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করা যায়, 'আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রের এরূপ করুণ ও ধিক্কারজনক অবস্থা' দেখে শুনে, মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেও এঁদের কেউ কেউ কেন সে 'ধিকৃত' অবস্থার শরিক হতে ঐ পুরস্কারের আশায় নিজেরা বই সাব্‌মিট করেছিলেন? আমাদের পুরস্কার প্রাপ্ত কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে কেউ আদমজী, দাউদ পুরস্কারের অর্থে জীবন ধারণ করেন বা করছেন এ অপূর্ব তথ্য আমার জানা ছিল না, শুনিনি কোনদিন—আর এ সম্ভব বলেও আমার বিশ্বাস নয়। এযুগে পাঁচ হাজার টাকায় জীবন ধারণ করা সম্ভব এ এক বা দুই বাতুলে ছাড়া কেউ বোধ করি বিশ্বাস করবে না। প্রবীণ শওকত ওসমান থেকে তরুণ শামসুর রহমান, হাসান আজিজুল হক পর্যন্ত সবাই কোন না কোন চাকরি করেই জীবিকা অর্জন করে থাকেন—এ তথ্য এ বিবৃতিকারদের জানা না থাকার কথা নয়। এ বিষয়ে প্রবীণ-নবীন সবাই সমান অর্থাৎ সকলকেই লেখার বাইরে অন্য কিছু একটা করে নিজের ও পরিবারের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করতে হয়। নোবেল প্রাইজের পরিমাণ লক্ষাধিক টাকা। সে টাকা নিয়েও রবীন্দ্রনাথ জীবন ধারণ করতেন বা করেছেন তেমন কথা শোনা যায়নি। পাঁচ হাজার টাকায় বড় জোর কারো সাময়িক বা আকস্মিক কোন একটা অভাব হয়তো পূরণ হতে পারে, জীবন ধারণ ত স্বপ্নাতীত।

সমাজের অন্য সব স্তরের মতো পুঁজিপতিদের মধ্যেও শ্রেণীভেদ আছে—বড়-ছোট, মাঝারি, ক্ষুদ্র-বৃহৎ ইত্যাদি। সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথ

যাকে 'ছোট টাকা' আর 'বড় টাকা' বলে বিশেষিত করেছেন। পুঁজির পরিমাণ আর শিল্প ও ব্যবসার আকার-আয়তন অনুসারে কেউ হয়তো কয়েক হাজার, কেউ বা কয়েক শ' লোক খাটান। কিন্তু উভয়ের চরিত্র একই—পুঁজিবাদের যা চরিত্র তা' ছোট আর বড়তে তেমন তারতম্য সৃষ্টি করে না। তারতম্য সৃষ্টি করে স্রেফ মুনাফার বেলায়। পবিত্র কোরান হাদিসের ব্যবসা যাঁরা করেন তাঁরাও মুনাফাটা কর্মচারী আর শ্রমিকদের মধ্যে বেঁটে দেন না। আমাদের দেশে এখনো লর্ড বীভারব্রুক (Beaverbrook) জন্মাননি সত্য কিন্তু ইতিমধ্যে তার ক্ষুদ্র সংস্করণ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে বেশ কয়টা গড়ে উঠেছে অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানায় যাঁরা তিন চারটা পত্রিকার মালিক হয়ে কয়েকশ. লোককে খাটান। বহুপ্রগতিশীল কবি সাহিত্যিক ঐসব প্রতিষ্ঠানে খেটে জীবিকা অর্জন করে থাকেন। কিন্তু বই লেখার খাটুনি, বিশেষ করে সৃষ্টিধর্মী লেখার শ্রম কি প্রুফ দেখা কিংবা সাংবাদিকী লেখার চেয়ে কম? বলাবহুল্য, খেটে জীবিকা অর্জন যেমন তেমনি খেটে বই লিখে সাহিত্য-পুরস্কার গ্রহণও কিছুমাত্র অসম্মানের নয়। মাস মাইনের যে-কোন চাকরির চেয়ে মোটামুটি উচ্চমানের একটা বই লেখার খাটুনি অনেক, অনেক বেশী। এসত্য প্রতিটি লেখকেরই জানা।

আমি উপরের কথাগুলি নিন্দাচ্ছলে বলছিনা, আমি বলতে চাচ্ছি আমাদের গোটা সমাজই যেখানে পুঁজিবাদী, সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো যেখানে পুরোপুরি পুঁজিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেখানে ব্যক্তিগতভাবে আমরা চাই না চাই, পুঁজিবাদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। পুঁজিপতিদের নামাঙ্কিত পুরস্কার গ্রহণ করলে পুঁজিপতিদের 'চরণাশ্রিত' হয়ে লেখকদের আত্মবিক্রয়ের সম্ভাবনা আছে মনে করে এমন কাজকে ধিক্কারজনক যাঁরা বলছেন তাঁরাও যে কিভাবে পুঁজিপতিদের দ্বারস্থ হচ্ছেন বা হতে বাধ্য হচ্ছেন, তার প্রতিই মাত্র আমি ইঙ্গিত করতে চেয়েছি উপরে। না হয়, অন্তত জীবিকার ব্যাপারে কারো নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কুমীর নির্বংশ হওয়ার আগে জলে বাস করে কুমীরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা স্রেফ ইচ্ছা করে উট পাখী সাজা।

সাম্যবাদী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় যখন ভারতীয় রাষ্ট্রপতি-পুরস্কার পেয়েছিলেন, তখন 'স্টেট্সম্যান' পত্রিকা মন্তব্য করেছিল—জাঁ 'পল সাত্রের পক্ষে যা সহজ, ভারতের বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরম শত্রু হয়েও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে তা' (অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি-পুরস্কার প্রত্যাখ্যান)

সম্ভব হয়নি।' ওঁদের রাষ্ট্রপতি-পুরস্কারেরও অর্থ—মান পাঁচ হাজার। বলাবাহুল্য, আমাদের অবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়।

প্রচলিত সাহিত্য-পুরস্কার বিরোধীরা তাঁদের বিবৃতিতে এমন দাবিও করেছেন: "সাহিত্য-পুরস্কারগুলিকে শিল্পগোষ্ঠী বা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের নামাঙ্কিত না করে বায়ান্ন সালের মহান ভাষা আন্দোলন এবং উনসত্তরের উত্তাল গণসংগ্রামের বীর শহীদদের মধ্য থেকে নির্বাচিত নামে ঘোষণা করার প্রস্তাব করুন।" অতি উত্তম প্রস্তাব, এমন প্রস্তাবে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু টাকা? সেতো আর প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে আলাউদ্দীনের দৈত্য এসে দিয়ে যাবে না কারো হাতে। জনসাধারণ থেকে চাঁদা তুলে তা' দিয়ে শহীদদের নামে সাহিত্য পুরস্কার ঘোষাণার তেমন প্রস্তাব কেন যে তাঁরা দিলেন না বুঝতে পারছিনা, দিলে তাই হতো সমুচিত ও যুক্তিসঙ্গত। এঁদের মতে পুরস্কারের টাকাটা আদমজী, দাউদ কিম্বা ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানগুলোই আগের মতো দিতে থাকুক কিন্তু ওদের নাম নেওয়া চলবে না মুখে! টাকাদাতার নাম ভুলে থাকা কি মুছে ফেলা সঙ্গত কিনা সে'টা বিবেক আর নৈতিকতার প্রশ্ন। কিন্তু আদৌ বাস্তবে কিনা তা'ও বিচার করে দেখা প্রয়োজন। ধরা যাক, অর্থ-প্রদানকারী শিল্পপতি কি শিল্পগোষ্ঠীর নাম উহ্য রেখে 'শহীদ বরকত' কিংবা 'শহীদ আসাদুজ্জামান' সাহিত্য-পুরস্কার না হয় ঘোষণা করা হলো। এতে কি পুরস্কারের চরিত্র বদলে যাবে? আর ব্যাপারটিত ওখানেই চুকে খতম হয়ে যাবেনা। টাকার উৎস কিছু লোকের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব হলেও সকলের কাছ থেকে তা' সম্ভব হবে না কিছুতেই। বিশেষত যে সংস্থার মারফত এ পুরস্কারগুলি বিতরিত হবে তা' তো শূন্য মার্গে বিচরণশীল হওয়ার কথা নয়। তেমন সংস্থার নিশ্চয়ই খাতাপত্র, হিসাব নিকাশ আর তা' লেখা-জোকার ব্যবস্থা থাকবেই। টাকা দাতা শিল্পপতি বা শিল্পগোষ্ঠীর নাম-ধাম অন্তত সেখানে তো লিখে রাখতেই হবে। তা' হলে কি বুঝতে হবে ঐ অনুচাষীদের নাম খাতা-পত্রে লেখা থাক তাতে ক্ষতি নেই কিন্তু বাইরে জাহির করা চলবে না! বলতে পারা যাবেনা 'আদমজী শহীদ বরকত' কিংবা 'দাউদ শহীদ আসাদুজ্জামান' সাহিত্য-পুরস্কার! কারণ এ করা হলে পুঁজিপতিদের 'নামাঙ্কিত' হওয়ার অপরাধ আর পাপ ত পুরোপুরিই থেকে যাবে। মনে হচ্ছে আমাদের এ বন্ধুদের আদম চৌধুরী আর দাউদ মিয়ার পুকুরের রুই কাতলার প্রতি তেমন অরুচি নেই, কিন্তু পুকুর দু'টির

মালিকের নাম উচ্চারণেই তাঁদের যত আপত্তি। একেই বলে ভাবের ঘরে চুরি। শহীদদের নামে সাহিত্য পুরস্কার প্রবর্তনে আমার ষোল আনা সায় আছে, এব্যাপারে বিবৃতিকারীরা উদ্যোগ গ্রহণ করলে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করতেও প্রস্তুত। তবে যেখানে শর্তহীন ভাবেও কৃতজ্ঞতা স্বীকৃতির উহ্য, লেখ্য, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য কোন দায় নেই, তেমন অবস্থায়ও আমি অকৃতজ্ঞ হতে রাজি নই। অকৃতজ্ঞতা আমাদের 'সেকেলে' নৈতিকবোধের বিরোধী। কৃতজ্ঞতা মহৎ চরিত্রের একটি লক্ষণ সে কথা না হয় নাই উল্লেখ করলাম। মরহুম ডক্টার শহদুল্লাহ্ সাহেব এক বার একপত্রে আমাকে লিখেছিলেন—'যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয় সে আল্লাহ্‌র প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়।'

॥ ৩ ॥

সাহিত্য-শিল্প যেমন দীর্ঘ মেয়াদি ব্যপার তেমনি সে সবের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানাদির গড়ে উঠে একটা জন-স্বীকৃত ঐতিহ্যে রূপ নিতেও বেশ সময় লাগে। তাই এসব প্রতিষ্ঠানকে গড়ে ও বেড়ে ওঠার সময় সুযোগ দিতে হয়। কালে কালে সব কিছুরই সূচনার ইতিহাস মানুষ ভুলে যায়, প্রতিষ্ঠান আর তার ঐতিহ্যই থাকে বেঁচে। এবং কালক্রমে রূপ নেয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি, রাজশাহার বরেন্দ্র সমিতি, বলদা মিউজিয়াম সবই বিত্তশালীদের অর্থে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান। এমনকি বিশ্বকবির বিশ্বভারতীও এর ব্যতিক্রম নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিভাগীয় 'চেয়ার', মেডেল, বৃত্তি ও 'লেকচার' বিত্তবান পুঁজি-পতিদেরই দান। দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিঙের দ্বারভাঙ্গা নাম বিনা কারণে হয়নি। এসব বিত্তশালীদের অনেকেই হয়তো অত্যাচারী ও প্রজাপীড়ক ছিল কিন্তু সে কথা কে আজ স্মরণে রেখেছে? পীড়ন-শোষণ কখনো কায়েমি হয়ে থাকে না, কায়েমি হয়ে থাকে সৎকর্ম আর তার স্মৃতি। হাজী মুহসিনও এক জমিদার বংশেরই ওয়ারিশ—আর জমিদারি কোন কালেই নিষ্কলঙ্ক ছিল ইতিহাসে তেমন প্রমাণ নেই। গোড়াতে যদি এঁদের নাম চিহ্নিত করার ধুয়া উঠতো তা' হলে অনেক প্রতিষ্ঠানই গড়ে ওঠারই সুযোগ পেত না। পূর্ব পাকিস্তানে দানশীল বিত্তবানের সংখ্যা অতি নগণ্য, তাই অনেক ব্যাপারে সরকারের উপর নির্ভর না করে পারা যায় না। ভাষা-আন্দোলনের অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে বাঙলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠা কিন্তু তার যাবতীয় ব্যয়ভার

সরকারকেই করতে হয় বহন। অথচ সরকার ছিল একদিন ভাষা-আন্দোলনের পরম শত্রু। বাংলা উন্নয়ন বোর্ডও সরকারী অর্থেই পরিচালিত। আমাদের অন্যতম সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'বুলবুল ললিতকলা একাডেমী' শুধু যে সরকারী সাহায্য পেয়ে থাকে তা' নয়, অনেক শিল্পপতি আর ব্যাঙ্কের কাছ থেকেও অর্থ-সাহায্য পায় ও নিয়ে থাকে। এ তথ্যও বোধ করি অনেকেরই জানা। এ সব সাহায্য ছাড়া, 'বুলবুল একাডেমী' টিকে থাকতে পারতো কিনা সন্দেহ। বিত্তবান আর শিল্প প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সাহায্য ছাড়া আজো আমাদের কোন বড় রকমের সাহিত্য কি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা যায় না—'সোভেনিয়'র বা 'স্মারক পুস্তিকার' তাৎপর্য ও ভূমিকা যাঁরা কখনো এ ধরনের অনুষ্ঠান করেছেন তাঁদের কাছে অজানা নয়। উপরে যে এক সাহিত্য সম্মেলনের উল্লেখ করেছি তাও এ পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার্য। যাঁরা পুঁজিপতি 'নামাঙ্কিত' সাহিত্য পুরস্কার গ্রহণে অসম্মত তাঁরাও কি করে যে পুঁজিপতিদের কৃপাপ্রার্থী তা' দেখাতেই শুধু তথ্যটার উল্লেখ করা হয়েছে এ লেখায়। পাকিস্তান লেখক সংঘও সরকারী উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত, গোড়ার দিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণও যে তার উপর ছিল না তা' নয়। কিন্তু লেখকরা আজব চরিত্রের মানুষ। যাঁরা খাঁটি ও আন্তরিক শিল্পী তাঁদের অন্তরে সব সময় একটা 'বিদ্রোহী সত্তা' প্রচ্ছন্ন থাকে। তাই দীর্ঘদিন এদের নিয়ন্ত্রণে রাখা কারো পক্ষে সম্ভব হয় না। লেখক সংঘের ব্যাপারেও এ দেখা গেছে। লেখক সংঘের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যরা বহু বার সরকারী কোন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আর বিবৃতি যে দিয়েছে তা ওয়াকিফহালদের ভালো করেই জানা। আমাদের ভাষা আর সাহিত্যের উপর সরকারী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে, বহু প্রবীণ ও তরুণ কবি-সাহিত্যিকরা যখন চুপ মেরে থেকেছেন অথবা ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছেন, তখনও লেখক সংঘের সদস্যরা সোচ্চার হতে দ্বিধা করেননি এতটুকু। সরকারের রবীন্দ্র-বিরোধিতা একটি সুপরিচিত ব্যাপার। লেখক সংঘের সদস্যরা সাহস আর ধৈর্যের সাথে তারও মোকাবিলা করতে কসুর করেননি। ঐ বিরুদ্ধতার সব চেয়ে মূল্যবান জবাব দিয়েছেন লেখক সংঘের অন্যতম সদস্য, 'দাউদ' পুরস্কারপ্রাপ্ত ডঃ আনিসুজ্জামান, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি সুপরিকল্পিত বই সম্পাদনা করে।

শহীদুল্লাহ কায়সর দীর্ঘকাল ধরে একটি সুবিদিত সরকারবিরোধী দৈনিক পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। আর তাঁর পুঁজিবাদ বিরোধিতা ও

সরকার বা অন্য কারো অজানা নয়, তবুও তাঁর পক্ষে 'আদমজী' সাহিত্য-পুরস্কার পেতে কোন বাধা হয়নি। সরকার প্রবর্তিত ট্রাষ্ট পত্রিকার চাকরি করেও শামসুর রহমানইত আমাদের বর্ণমালার বিরুদ্ধে আক্রমণের সবচেয়ে জোরালো উত্তর দিয়েছেন কবিতার মাধ্যমে। যে সব প্রবীণ আর তরুণ কবি 'দাউদ' বা 'আদমজী' সাহিত্য-পুরস্কার গ্রহণ করলে 'পুঁজিপতিদের চরণাশ্রিত' হয়ে পড়ার কাল্পনিক ভয়ে এখন যত সব বেসামাল উক্তি করেছেন তাঁরা আমাদের এসব তরুণদের দিকে তাকিয়ে দেখলে বুকে সাহস আর মনে বল পাবেন। আর বুঝতে পারবেন খাঁটি লেখকদের চরিত্র এমন হালকা নয় যে মাত্র পাঁচহাজার তংকার বিনিময়ে তাঁরা পুঁজি-পতিদের চরণাশ্রিত হয়ে পড়বেন। আমাদের সাহিত্যের খবরাখবর যাঁরা রাখেন তাঁরা জানেন এখনকার লেখক সংঘ ঠিক সূচনার যুগের লেখক সংঘ নয়। নয় বলেই 'মহাকবি সম্মেলন', 'স্বদেশী গানের আসর' 'আফ্রো-এশীয় সাহিত্য সংস্কৃতি' অনুষ্ঠান প্রভৃতির আয়োজন করা লেখক সংঘের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। লেখক সংঘের মুখপত্র 'পরিক্রমে' আমি এযাবত সরকার কিম্বা পুঁজিপতিদের প্রচারণামূলক কোন লেখা দেখিনি। কালের দীর্ঘ ব্যবধানে নোবেল প্রাইজের আজ এমন একটা বিশ্বব্যাপী ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে যে আলফ্রেড নোবেলের ডিনামাইট আবিষ্কার আর তার সর্বাত্মক ধ্বংসকর ভূমিকার কথা লোকে ভুলেই গেছে—তার দান ও অবদানের মূল্যটাই রয়ে গেছে চিরজীবী হয়ে। আমার বিশ্বাস অনুরূপভাবে 'আদমজী' বা 'দাউদ' শিল্পগোষ্ঠীর যদি কোন অশুভ ভূমিকা থেকেও থাকে, কালক্রমে সমাজ বিবর্তনের সাথে সাথে তা' মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে যাবে, টিকে থাকবে তাদের অবদান আর তার থেকে সৃষ্ট ঐতিহ্যটুকুই। অবশ্য ক্ষেত্র আর পরিমাণ অনুসারে তা হবে ক্ষুদ্রায়তন।

তবে সব কিছুই কালের উপর, সমাজ বিবর্তন আর তার মূল্যবোধের উপরই নির্ভরশীল। যা কিছুতে শুভের সম্ভাবনা আছে, তাকে বিনষ্ট করার আমি বিরোধী। আর এও আমার বিশ্বাস মানুষের মতো কোন প্রতিষ্ঠানও অশোধনীয় নয়।

১০

নজরুলের কবিকণ্ঠ

নজরুল সাহিত্য আমাদের সম্পদ, আমাদের উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্য। তাঁর রচনার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষ। তার ভাষা, আঙ্গিক, রূপকল্প আর ভাবাদর্শ সবই আমাদের মানস-চেতনা আর অভিজ্ঞতায় বলয়িত। আমাদের জীবন আর জীবনের বিচিত্র অভীপ্সার সাথে তাঁর সম্পর্ক ওতপ্রোত। তার কণ্ঠস্বর আজো আমাদের প্রেরণার উৎস। নজরুলকে অধ্যয়ন না করে আমাদের উপায় নেই আর অধ্যয়ন করতে হবে নানাদিক থেকে। নজরুলের কবি-জীবন স্বল্পায়ু—স্বল্পায়ু হলেও তাতে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। সে বৈচিত্র্যের অবগাহন না করলে নজরুল সাহিত্যের সম্যক পরিচয় গ্রহণ সম্ভব নয়। সম্ভব নয় তার অবদানের যথাযথ মূল্যায়নও। নজরুল শুধু কবি ছিলেন না। ছিলেন না স্রেফ সঙ্গীতকার কিম্বা কম্পোজার বা স্বল্পসংখ্যক গল্প-উপন্যাস, নাটক-নাটিকার লেখক। নিঃসন্দেহে রচনার এসব বিচিত্র শাখা-প্রশাখায় তাঁর বিহার ছিল স্বাচ্ছন্দ। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান নেহাত নগণ্য নয়। তবু সবচেয়ে বড় কথা, তিনি ছিলেন যুগ-প্রতিনিধি। তাঁর সম-সাময়িকদের মধ্যে তার ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ ও সবার উর্ধ্বে। তাঁর মনের স্বাভাবিক প্রবণতার সঙ্গে মিশেছিল দেশ, জাতি, যুগ আর মানবতার দাবি। যে দাবি তিনি উপেক্ষা করেননি, পারেননি উপেক্ষা করতে। তা, ছিল তাঁর প্রবল আবেগী চেতনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই তাঁকে হতে হয়েছিল যুগের কণ্ঠস্বর। বলাবাহুল্য, যুগের দাবীও কম প্রবল নয়, কারন তার সঙ্গে দেশ, জাতি, আর মানবতার ভাগ্য বিজড়িত। কোন কবিই পারেন না এসবের বাইরে গিয়ে উটপাখী হয়ে থাকতে। চার-দিকের ঘটনাস্রোতের প্রতি চোখ-কান বন্ধ করে থাকা কোন সচেতন কবি কিম্বা শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব নয়। নজরুলমানস শুধু যে তীব্র সংবেদনশীল

ছিল তা' নয়, তা' ছিল অত্যন্ত উদ্ধত আর তীব্র আবেগপ্রবণও। এমন কবির পক্ষে 'পলাতকা' সাজা অকল্পনীয়। সাময়িকতাই নজরুলকাব্যের প্রধান বিশিষ্টতা—এ মন্তব্য সত্য নয়। সাময়িক বহু বিষয়ে তিনি অজস্র কবিতা লিখেছেন—রচনা করেছেন দেদার সঙ্গীত এ বিনা দ্বিধায় স্বীকার্য। তবুও তাঁর কবিখ্যাতি স্রেফ সাময়িকতানির্ভর এ বলা যায় না। যুগ আর সমাজের একটা অপ্রতিরোধ্য দাবী আছে—সে দাবি আর দায় নজরুল সর্বান্তঃকরণে পালন করেছেন। এসবকে তিনি মনে করতেন তাঁর কবি-কর্মের অপরিহার্য অঙ্গ। যারা এ সম্বন্ধে আপত্তি তুলেছেন, কঠোর ভাষায় তার উত্তর দিতেও তিনি করেননি কসুর। এমনকি রবীন্দ্রনাথের আপত্তিকেও তিনি দেননি আমল। শুধু কবি হয়ে থাকতে চাননি তিনি কোনদিন. একমাত্র সে পরিচয়ে খোঁজেননি আত্মতৃপ্তি। এক দিকে দেশ, সমাজ আর যুগের যেমন তিনি প্রতিনিধি, তেমনি অন্য দিকে সারা বিশ্বের নির্যাতিত মানবতারও তিনি মুখপাত্র। তাঁর 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা' মানবতারই ফরিয়াদ, তারই জয় ঘোষণা। তাদের মূক মুখের কথাই তাতে ধ্বনিত। মানুষকে তিনি খণ্ডিত করে, বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি কখনো—মানবতার এ সার্বিক উপলব্ধিতে তিনি রবীন্দ্রনাথের সগোত্র। তবে রবীন্দ্রনাথ যেখানে অধিকতর সুকোমল. নমনীয় আর শালীন, নজরুল সেখানে স্পষ্টবাক্, সোচ্চার, রূঢ়, এমনকি স্থানবিশেষে আটপৌরেও। আমাদের ইতিহাসের এক বিশেষ পর্বে নজরুলের আবির্ভাব সে-কথা স্মরণে রেখেই তার শিল্পীসত্তা আর কবি-কর্ম বিচার্য। এক সুশান্ত নিস্তরঙ্গ জীবন রবীন্দ্রনাথ উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছিলেন—নজরুলের জীবন ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। অমন উত্তাল, অস্থির ও তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ জীবন এদেশে অন্য কোন কবি যাপন করেছেন কিনা সন্দেহ। মধুসূদনের জীবনের অস্থিরতা ও অতৃপ্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের—তার সঙ্গে দেশ, জাতি আর মানবতার সম্পর্ক ছিল না মোটেও। 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়'—তাঁর সম্বন্ধে তার নিজের এ উক্তিই যথার্থ। বলাবাহুল্য, এ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। নজরুল কখনো অহং বা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার শিকার হননি। তিনি সৈনিক হয়েছেন, সম্পাদনা করেছেন পত্রিকা। অভিযুক্ত হয়েছেন রাজদ্রোহের অপরাধে। দ্বিধা করেননি কারাজীবন বরণ করে নিতে। এমন মানুষের কবি-কণ্ঠ বক্তব্যপ্রধান না হয়ে পারে না। এমন কণ্ঠের ভাষা কিছুতেই হতে পারে না দুর্বোধ্য কিম্বা রহস্য-ঘন। নিজের

বক্তব্য সম্বন্ধে নজরুলের প্রত্যয় অত্যন্ত দ্বিধামুক্ত। বাংলা কাব্যে এমন সুদৃঢ় প্রত্যয় খুব কম দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে নজরুলের বক্তব্যই নজরুলের কবিতা। যেমন:

তখ্‌তে তখ্‌তে দুনিয়ায় আজি
কমবখ্‌তের মেলা,
শক্তি-মাতাল দৈত্যরা সেথা
করে মাতলামী খেলা।

ভয় করিয়ো না, হে মানবাত্মা
ভাঙ্গিয়া পড়ো না দুঃখে,
পাতালের এই মাতাল রবে না
আর পৃথিবীর বুকে।

তখ্‌তে তাহার কালি পড়িয়াছে
অবিচারে আর পাপে
তলোয়ারে তার মরিচা ধরেছে
নির্যাতিতের শাপে,
(ভয় করিও না হে মানবাত্মা)

নজরুল সবরকম দুর্বলতা আর কাপুরুষতার শত্রু, 'বল বীর বল উন্নত মম শির'—মনে হয় তার সমগ্র কাব্যের এটাই প্রধান সুর। স্বদেশ আর স্বজাতির দুর্বলতা সম্বন্ধে তিনি সব সময় সচেতন ছিলেন। তাই বারে বারে জাতিকে শুনিয়েছেন অভয় বাণী। দুরারোগ্য ব্যাধির শিকার হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তার কণ্ঠে এ সুরই হয়েছে ধ্বনিত:

অন্তরে আর বাহিরে সমান
নিত্যপ্রবল হও।
যত দুর্দিন ঘিরে আসে, তত
অটল হইয়া রও।

যত পরাজয়-ভয় ত্রাসে তত
দুর্জয় হয়ে উঠ
মৃত্যুর ভয়ে শিথিলবেন না।
হয় তলোয়ার মুঠো।

সত্যের তারে দৈত্যের সাথে
করে যাও সংগ্রাম,
রণক্ষেত্রে মরিলে অমর—
হইয়া রহিবে নাম!
ইত্যাদি

(নিত্যে প্রবল হও)

এগুলি নজরুলের খুব বিখ্যাত কিংবা জনপ্রিয় কবিতা নয়। তবুও এখানেও সত্যিকার নজরুলকেই আমরা দেখতে পাই। শুনতে পাই তাঁরই কণ্ঠস্বর। কবির এ কণ্ঠস্বর আজও পুরানো হয়নি। তাঁর প্রয়োজন আজও হয়নি নিঃশেষিত। বরং তাঁর প্রয়োজন যেন আরও বেশী করে দেখা দিয়েছে। যে সামাজিক পরিবেশে নজরুল এসব কবিতা লিখেছেন তার কোন রূপান্তর ঘটেনি। অধিকন্তু—অবক্ষয় এখন রূপ নিয়েছে আরও সর্বগ্রাসী। এ পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় একমাত্র নজরুলের কবিকণ্ঠেই হতে পারে আমাদের দিশারী। ঐ কণ্ঠেই আমরা খুঁজে পাবো নতুন প্রেরণা, উৎসাহ ও প্রত্যয়।

কমরেড্ মুজাফ্ফর আহমদ

কমরেড্ মুজাফ্ফর আহমদের সঙ্গে তুলনা দেওয়ার মতো কোন মানুষকেই আমি খুঁজে পাই না। তিনি এত অসাধারণ আর এত বিশিষ্ট ছিলেন। এ উপমহাদেশের রাজনৈতিক আকাশে তাকে শুকতারার মতই মনে হতো আমার। কোমল, শান্ত অথচ দীপ্তিমান। আমাদের সামনে তিনি ছিলেন মনুষ্যত্ব আর মহৎ মূল্যবোধের প্রতীক—রাজনীতি ক্ষেত্রে দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য এবং আজকের দিনে যা সর্বত্র দুর্নিরীক্ষ। চাক্ষুষ দেখা হওয়ার বহু আগে থেকেই তাঁকে আমরা জানতাম নামে এবং কর্মপরিচিতিতে। তখন থেকেই বোধ করতাম তার প্রতি এক অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। এ শ্রদ্ধা ছিল তাঁর ত্যাগ, নিষ্ঠা আর সততার প্রতি। একদা আমার 'রেখাচিত্র' নামক গ্রন্থে তার সম্বন্ধে এ স্মৃতি মন্থনটুকু করেছিলাম : "এ যাত্রা (১৯৪০-এ আমি যখন প্রাইভেট এম. এ. পরীক্ষা দিতে কলকাতা যাই) কমরেড্ মুজাফ্ফর আহমদের সঙ্গেও একবার দেখা হয়েছিল। এ শীর্ণকায় সুদর্শন আর অত্যন্ত অমায়িক ও কোমলস্বভাব লোকটিকে আমরা দূর থেকে খুবই শ্রদ্ধা করতাম। বিশেষ করে আমি আর আমার বন্ধু দিদারুল আলম। তাঁর রাজনীতির স্বরূপ তখন আমাদের ভালো করে জানা ছিল না—হয়তো বুঝতামও না কিন্তু আমাদের তখন বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল তাঁর নিষ্ঠা আর চারিত্রিক সততা। অমন নিঃস্বার্থ কর্মী যে-কোন দেশের ও সমাজের গৌরব। তিনি নিজের জন্য কোনদিন কিছু চাননি—সব সময় অনুবর্তীদের ঠেলে দিয়েছেন সামনের দিকে। নেপথ্যে থেকে নিজে জুগিয়েছেন শক্তি, পরামর্শ ও প্রেরণা। তাঁর সম্পাদিত 'গণবাণী' ও 'লাঙল' আমাদের প্রিয় পাঠ্য ছিল। নজরুলেরও দেদার লেখা বেরিয়েছে ঐ দুই পত্রিকায়। নজরুলের সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছের মূল উৎসই মুজাফ্ফর আহমদ। বোধ করি মান্দালয় জেল থেকে বেরিয়ে আসার পরপরই সুভাষচন্দ্র বসু একবার পূর্ববঙ্গ সফরে এসেছিলেন। ঢাকায় এলে সলিমউল্লাহ্ মুসলিম

হল ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও তাঁকেও কিছু বলার জন্য করা হয়েছিল অনুরোধ। এ অনুরোধ তিনি রক্ষা করেছিলেন। কুষ্টিয়ার শামসুদ্দীন আহমদ সাহেবকে (অবিভক্ত বাংলার প্রাক্তন মন্ত্রী) সঙ্গে নিয়ে হলে এক ছাত্রসভায় তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। যতদূর মনে পড়ে সে বক্তৃতার সূচনায় তিনি বলেছিলেন : 'বাংলাদেশে মুসলমানরা সংখ্যায় অনেক বেশী, আমি চাই কংগ্রেসের নেতৃত্বে তাঁরা এসে গ্রহণ করুন। আমি আমার বন্ধু মুজাফ্‌ফর আহমদকে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি হতে অনেক অনুরোধ উপরোধ করে ব্যর্থ হয়েছি, কোন প্রকারে তাঁকে শুধু সহ-সভাপতি হতে রাজি করাতে পেরেছি। এ হচ্ছে মুজাফ্‌ফর আহমদের চরিত্রের একদিক। পদ আর পদবীকে তিনি সব সময় এড়িয়ে চলেছেন। তখন সুভাষচন্দ্র ছিলেন প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি আর মুজাফ্‌ফর আহমদ ছিলেন অন্যতম সহ-সভাপতি। বলা বাহুল্য, তখনো সমাজতন্ত্রী আর সাম্যবাদীরা কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েনি। ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির তখনো শৈশব কাল।

পরীক্ষার জন্য আমি উর্দু নিয়েছি শুনে মুজাফ্‌ফর সাহেব বল্লেন : উর্দু না নিয়ে আপনি হিন্দী নিলেই ভালো করতেন। উর্দুর তুলনায় হিন্দী অনেক সোজা—নাম্বার উঠতো অনেক বেশী। আসামী আর উড়িয়া ভাষার কথাও যেন বলেছিলেন। সর্বপ্রথম তার মুখেই শুনলাম বাবুরাম সেক্সেনার The History of Urdu Literature-এর কথা। এ বইটি পড়ে আমি খুব উপকৃত হয়েছি। বাংলা সাহিত্যে দীনেশ চন্দ্র সেনের 'বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের' যে স্থান উর্দু সাহিত্যের সেক্সনার বইটিরও সে একই স্থান। এরপর অবশ্য এ দুই সাহিত্যে যথেষ্ট নতুন গবেষণা হয়েছে, সংগৃহীত হয়েছে বহু নতুন তথ্য ও উপকরণ। লেখা হয়েছে আরো প্রামাণ্য ইতিহাস। কিন্তু এঁদের প্রাথমিক গবেষণা ও শ্রমের মূল্য না মেনে উপায় নেই।

মুজাফ্‌ফর আহমদকে আমরা শুধু এক বিশেষ দলের রাজনীতিবিদ্‌ বলেই জানতাম। কিন্তু তিনি যে কতখানি পণ্ডিত আর ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষা ও তার সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর পরিচয় যে কত ব্যাপক ও গভীর, সেদিনের স্বল্পকালীন আলাপ-আলোচনায় তার কিছুটা আঁচ করতে পেরে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম।" অন্যত্র : "সাতচল্লিশের চৌদ্দই আগষ্ট আমরা স্বাধীনতা পেলাম। ঐ বছরের শেষের দিকে কলকাতা থেকে হঠাৎ কম্যুরেড মুজাফফর আহমদ এলেন চাটগাঁ। তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র কলকাতা কিন্তু

জন্মস্থান পূর্ব পাকিস্তানের সন্দ্বীপ। দেশ স্বাধীন হয়েছে—প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নিজের জন্মভূমিতে নিজের একটা নতুন রাষ্ট্র। এখন সাধারণ মানুষের অবস্থা কি দাড়িয়েছে তা দেখতেই বোধকরি এবার তার এখানে আগমন। এ যাত্রা তাঁর কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল কি না তা' আমার অজানা। তার অভ্যর্থনা উপলক্ষে স্থানীয় জে. এম. সেন হলে কারা যেন একটা জনসভা আহ্বান কবেছিল। আগেই বলেছি মুজাফ্ফর সাহেবের প্রতি একটা গভীব শ্রদ্ধাবোধ আমাব দীর্ঘদিনেব, তাই খবর পেয়ে আমিও গিয়ে হাজির হয়েছি ঐ সভায়। সবকাবী কর্মচাবীদেব গতিবিধি সম্বন্ধে বৃটিশ আমলের আইন-কানুন এখনো বহাল আব সক্রিয় রয়েছে তা সেদিন মোটেও আমার খেয়াল আসেনি। দেশ স্বাধীন হয়েছে—আমরা সবাই স্বাধীন নাগরিক এ বোধটাই ছিল তখন মনেব ভিতর প্রবল। তাই সভায় হাজির হতে কোন দ্বিধাই বোধ করিনি মনে। কিন্তু গিয়ে পড়লাম বিপদে। আমাকে আগে কিছুমাত্র আভাসমাত্র না দিয়ে উপস্থিত কে একজন আমার নামটি প্রস্তাব করে বসলে সভাপতির আসন গ্রহণের জন্য। আমার আপত্তি অগ্রাহ্য করে অন্য আব একজন ত্বরিত উঠে প্রস্তাবটা করে বসলে সমর্থন: আমি পড়ে গেলাম দো-টানায়। কি করা যায়? এখন অস্বীকার করা মানে মুজাফ্ফর সাহেব আর সভাব উদ্যোক্তাদের অত্যন্ত বেকায়দায় ফেলা। অন্যদিকে মুজাফফর সাহেব যে পাকাপোক্ত রাজনীতিবিদ্ তাও আমার অজানা নয়। বিখ্যাত মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার পহেলা নম্বরে আসামী ছিলেন তিনি, কিছুদিন আগেও তাকে সরকার এক জেলা থেকে অন্য জেলায় তাড়া করে ফিরেছে, জেল, হাজত, নজরবন্দী, দীর্ঘ কারাবাস যাঁর ভাগ্যে বার বাবই ঘটেছে আর যার প্রধান পবিচয় 'ভারতীয় কমিউ-নিজমের জনক'। তেমন মানুষেব সংবর্ধনা সভায় আমার মত এক পাকা সরকারী চাকুরেব পক্ষে সভাপতিত্ব করা সমীচীন কিনা এ দ্বিধা যে মনে মুহূর্তে জেগে ওঠেনি তা' নয়। কিন্তু প্রস্তাব গৃহীত হওয়াব পর ভাববার সময় কোথায়? বেঁকে বসলে আমার মুখই বা থাকে কি করে? হল ভর্তি মানুষ সবাইত আমাকে চেনে। অগত্যা কপাল ঠুকে সভাপতির আসনে গিয়ে বসে পড়লাম। সবাইর শেষে অতিথির গুণকীর্তন করে ভাষণও দিতে হলো আমাকে।

এ ঘটনার বেশ কিছুকাল পবে, ১৯৪৮ এর ২৫শে ফেব্রুয়ারী আমি হঠাৎ কলেজ অধ্যক্ষের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম। খামের উপর লেখা 'Confidential' বা গোপনীয়। চিঠিখানা নিম্নরূপ:

The District Magistrate, Chittagong reports in his Confidential D. O. 13/C dated 8. 1. 48 and in his Memo No. 222/C dated 20. 2. 48 that you presided over a political meeting in the local J. M. Sen Hall on 15-11-47 and enlogised one of the Speakers. Mr. Muzaffar Ahmed, who demanded the removal of European officers, and points out this activity on your part is in violation of R 23 of Government Servents conduct Rules which lays down : "No Govt. servant shall take part in or subscribe in aid of or assist in any way any political movement in India or any political movement relating to Indian affiairs.

I am, therefo re to request you to be so good as to favour me with your statement in explanation at your earliest convenience.

বুঝতে পারলাম সরকারী আইনে আজো ইণ্ডিয়া মানে পাকিস্তানও। যতদূর মনে পড়ে জবাবে আমি মুজাফ্‌ফর আহমদের সাহিত্যকর্মের একটা খতিয়ান দিয়েছিলাম। তিনি কলকাতার বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সহ-সম্পাদক ছিলেন এবং উক্ত নামের ত্রৈমাসিক পত্রিকারও। এ. কে. ফজলুল হকের দৈনিক 'নবযুগ' প্রতিষ্ঠা আর সম্পাদনায়ও তাঁর হাত ছিল। সর্বোপরি যুদ্ধ-ফেরত নজরুলকে তিনিই সর্বাগ্রে দিয়েছিলেন আশ্রয়, দীর্ঘকাল ধরে করেছেন কবির পৃষ্ঠপোষকতা আর নানাভাবে সাহিত্য ব্যাপারে তাঁকে করেছেন উদ্বুদ্ধ ইত্যাদি। এ সঙ্গে আমার সাহিত্যকর্মেরও একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছিলাম। উপসংহারে বলেছিলাম : 'সাহিত্যক্ষেত্রে মুজাফফর আহমদের যেটুকু অবদান তার জন্যই তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে আমি সভায় গিয়েছিলাম। আর সভাসমিতিতে কোন্‌ বক্তা কি বলবে তা পূর্বাহ্ণে আঁচ করা কোন সভাপতির পক্ষেই সম্ভব নয়।' এরপর আর কোন উচ্চবাচ্য হয়নি কোন পক্ষ থেকেই। কমরেড মুজাফ্‌ফর আহমদকে আমরা যে বেশ এক বিশেষ দৃষ্টিতে দেখতাম, দীর্ঘকাল আগে লেখা দুই উদ্ধৃতি থেকে তা সহজেই অনুমান করা যাবে। আমাদের এ দৃষ্টিতে কিছুমাত্র ফাঁকি ছিল না ; ছিল না কোনরকম কৃত্রিমতা বা উদ্দেশ্য। সন তারিখ মনে নেই—১৯৩৭ কি ৩৮ হবে। মুজাফ্‌ফর আহমদ তখন আত্মগোপন অবস্থায় ;

তাঁর উপর ঝুলছিল ছুলিয়া। আমি তখন চট্টগ্রাম সরকারী কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষক। হঠাৎ কানাকানিতে শুনতে পেলাম মুজাফ্ফর সাহেব চাটগাঁ এসেছেন, দেওয়ানবাজারের এক বাড়িতে আত্মগোপন অবস্থায় আছেন, এসেছেন পার্টিকর্মীদের পরামর্শ দিয়ে সংঘবদ্ধ করতে। তাঁকে দেখার আর তাঁর সঙ্গে আলাপ করার এক অদম্য ইচ্ছা আমাকে যেন পেয়ে বসলো সেদিন। যদিও কোন অর্থেই আমি রাজনীতিবিদ্ নই—কমিউনিষ্ট ত নয়-ই। তবুও চুম্বকের মতো একটা আকর্ষণ বোধ না করে পারলাম না। সন্ধ্যার পর রাত্রের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তাঁর আস্তানার সামনে গিয়ে হাজির হলাম। খবর দিতেই তিনি বেরিয়ে এসে আমার পরিচয় জেনে অত্যন্ত অবাক হয়ে গেলেন। বল্লেন: আপনি এক্ষুণি চলে যান। আই, বি-র লোক ওঁৎ পেতে আছে সর্বত্র। আর কিছু না হোক আপনার চাকরি থাকবে না।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে এ কথা ক'টি বলে একরকম জোর করে তিনি আমায় বিদায় করে দিলেন। নিজের সম্বন্ধে কোন দুশ্চিন্তা তিনি প্রকাশ করলেন না, মনে হলো আমার ভবিষ্যৎ বিপদের কথা ভেবেই তিনি উদ্বিগ্ন। মুজাফ্ফর আহমদের চরিত্রের এও আর এক দিক: নিজের কথা ভাবতেন না, ভাবতেন অপরের কথা সব সময়। তাঁর রাজনীতির বুনিয়াদ এ দর্শনের উপর। একদা জীবনের শুরুতে তিনি সরকারী চাকরি করতেন, অনুবাদ বিভাগে। সে চাকরি চলে যাওয়ার বা ছেড়ে দেওয়ার পর শুনেছি তাঁর এক দেশী খ্রীষ্টান সহকর্মী তাঁকে চায়ের দাওয়াত করেছিলেন। পরদিন সে সহকর্মীটির চাকরি চলে যায়। জীবনে এ একটি ভুলের অনুতাপ মুজাফ্ফব সাহেব কখনো ভুলতে পারেন নি। সে থেকে সরকারী চাকুরে-বন্ধু বা অনুরাগীদের বাসায় তিনি কখনো যেতেন না এবং তাঁদের সঙ্গ স্বেচ্ছায় এড়িয়ে চলতেন।

তিনি শীর্ণকায় ও দুর্বল-দেহ ছিলেন কিন্তু তাঁর মনের জোর আর চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিল অসাধারণ। তাঁর সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে গোপাল হালদার তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন: "এ মানুষ ভাঙতে পারেন দেহতে. কিন্তু ভাঙবে না, মচকাবেন না মনুষ্যত্বের হিসাবে।"

তাঁর এ মনুষ্যত্ব কমিউনিষ্ট অ-কমিউনিষ্ট কখনো বাচ-বিচার করেনি। রাজনীতি, সারাজীবন কঠোর বিধি-বিধানে বাঁধা রাজনীতি করে, কি করে একজন মানুষ এমন অজাতশত্রু থাকতে পারে এ ভাবা যায় না। রাজনৈতিক

বিপক্ষকে অনেক সময় শত্রু ভাবা হয়, বিশেষ করে আমাদের দেশে, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও মুজাফফর আহমদ ছিলেন ব্যতিক্রম। তাঁর মতামতের বা তাঁর প্রতিষ্ঠানের বিরোধী ও বিপক্ষের অন্ত ছিল না কখনো, কিন্তু কেউ মুজাফ্‌ফর আহমদকে শত্রু ভাবার কথা মনেও স্থান দেয়নি কোনদিন। গোপাল হালদার তাঁর উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র লিখেছেন: "আমার বোন লক্ষ্মী তাকে দেখেছে। লক্ষ্মী কমিউনিষ্ট নয়, কমিউনিষ্ট বুঝতও না। কিন্তু ঘরের পাশে রাতদিন দেখেছি কমিউনিষ্ট ছেলেদের, সুনীল, সুশীল, সোমনাথ, মনসুর প্রভৃতিকে। আর তাদের গার্জেন 'কাকাবাবু' মুজাফ্‌ফর আহমদকে। তার ফলে কমিউনিষ্টদের নিন্দা লক্ষ্মী সইতে পারত না। কারণ, তারা কেমন মানুষ, সে তো নিজের অভিজ্ঞতাতেই জানে।" এ কেমন মানুষ'দের নির্মাতা স্বয়ং কমরেড মুজাফ্‌ফর আহমদ। তিনিই নিজের হাতে এক-একটি কর্মীকে গড়ে তুলেছেন। মুজাফ্‌ফর আহমদ আর তার গড়া কর্মীদের অভয় হস্ত কিরকম নির্ভরযোগ্য ছিল তা গোপাল হালদার মশায়ের জবানিতে শোনা যাক: ধর্মতলা ষ্ট্রীটে লক্ষ্মীর পাশের ফ্ল্যাটে তারা থাকতেন—মুজাফ্‌ফর আহমদ ও পার্টির কয়েকটি তরুণ কর্মী। লক্ষ্মী ডাক্তারী চেম্বার শুদ্ধ নিজ ফ্ল্যাটে থাকত একা। একা বলে কোন ভাবনাই তার ছিল না—'কাকাবাবু' আছেন, দাদারাও এর থেকে বেশী দেখাশুনা করতে পারতেন না। দেশ-বিদেশে লক্ষ্মী বহু মানুষকে দেখেছে। তীক্ষ্ণ ছিল তার দৃষ্টি, দুর্বার বিচার-বুদ্ধি। তার কথাতেই শেষ করি —"এমন (কঠিনপ্রতিজ্ঞা) মানুষ যে এত সহজ হতে পারেন, ভালে-বাসেন সকলকে, তা ভাবতেই পারতাম না—কাছে থেকে তাঁকে না দেখলে।" তাকে মানে মুজাফ্‌ফর আহমদকে।

হয়তো এমন মানুষ সম্বন্ধেই বলা হয়েছে—বজ্রের চেয়ে কঠোর আর ফুলের চেও নম্র। বীরত্ব দেহে নয়, বীরত্ব মনে আর চরিত্রে। মুজাফ্‌ফর আহমদ তেমন বীরত্বের অধিকারী ছিলেন। ডাক্তার লক্ষ্মী হালদার এ বীরত্বের সন্ধান জানতেন। তাই নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে অত নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন। অদূরে কাকাবাবু আছেন এ কথা ভেবে। মুজাফ্‌ফর আহমদের একটি বড় বৈশিষ্ট্য চিন্তা আর বক্তব্যে স্বচ্ছতা। অবশ্য এ দুই পরস্পরের পরিপূরক। চিন্তায় স্বচ্ছতার অভাব ঘটলে বক্তব্যে অস্বচ্ছতা না এসে পারে না। তাঁর রচনারও বড়গুণ স্বচ্ছতা, পরিচ্ছন্ন চিন্তা আর বস্তুনিষ্ঠা। কোথাও গোজামিলের আশ্রয় নেননি তিনি রচনায় কিংবা

বক্তব্যে। তাঁর বাল্য রচনায়ও নাকি এ গুণটির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। আবারও গোপাল হালদারের আশ্রয় নিচ্ছি : "বাড়ীতে যে 'প্রবাসী' আসে তাতে সেবার প্রকাশিত হয়েছে ছবিশুদ্ধ একটি লেখা—'সন্দ্বীপের পুন্নাম বৃক্ষ', লেখক 'মুজাফ্ফর আহমদ'। বোধ হয় ১৩১৮ বাংলার কথা। বাবাকে দাদাই জানালেন লেখক শহরের জেলা স্কুলের ছাত্র। বাবা পড়লেন, খুশী হলেন, বল্লেন : 'বা: বেশ সুন্দর পরিষ্কার লেখা।'...তথ্যযুক্ত একটি ছোট লেখা—পুন্নাম গাছ থেকে তেল হয়, সে তেল সন্দ্বীপের লোকেরা জ্বালায় ইত্যাদি। সরল, তথ্যযুক্ত, শব্দাড়ম্বরহীন লেখা। সত্যিই 'সুন্দর পরিষ্কার লেখা।' বাবার কথাটাতে শুধু লেখাটা নয়। মানুষটির চরিত্রের একটি দিকও প্রকাশিত। হাতের লেখা দেখলে তা আরো বলা যেত। বাংলা ইংরেজী এমন মুক্তার মতো বড় বড় অক্ষর, পরিষ্কার হস্তে লেখা আর দ্বিতীয় কারো নেই ভূভারতে। ভাষায়ও ঠিক এ গুণটি আছে—স্পষ্টতা, পরিচ্ছন্নতা, নিশ্চয়তা। আর ঐ প্রবন্ধটিতেই ছিল মুজাফ্ফর সাহেবের দৃষ্টিকোণেরও পরিচয়—অবজেক্টিভ তথা তথ্যনিষ্ঠা।"

মুজাফ্ফর সাহেবের চিন্তা আর রচনার এ এক সঠিক মূল্যায়ণ বলেই আমি মনে করি। তিনি সারাজীবন গঠনমূলক রাজনীতি করেছেন, ভাঙ্গনের রাজনীতি করেননি কখনো। তার রাজনীতির লক্ষ্য ছিল জনসাধারণ তথা কৃষক মজুর, যারা দেশের জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ। এ জনসাধারণের সঠিক কল্যাণের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হিসেবে তিনি কমিউনিজম বা সাম্যবাদকেই গ্রহণ করেছিলেন। সাম্যবাদের বিরাট এক ভাববাদী রূপ আছে, তাই খাঁটি সাম্যবাদীরা শুধু কর্মে তৃপ্ত থাকেননি, ভাবকেও ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন সর্বত্র। এভাবে গড়ে উঠেছে বিরাট সাম্যবাদী সাহিত্য। তাই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে মুজাফ্ফর আহমদও গড়ে তুলেছেন কর্মীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পার্টি মুখপত্র ও মুদ্রাযন্ত্র এবং পুস্তক প্রকাশনা ও প্রচারণ সংস্থা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশেনাল বুক এজেন্সি' আজ এক সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত। তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল সারা ভারত আর তিনি ছিলেন সর্বক্ষণের রাজনীতিবিদ্। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রাজনীতি থেকে তিনি কোনদিন কোন ফায়দা ওঠাননি। স্বাধীন ভারতে ক্ষমতাসীনরা সবাই তাঁর পরিচিত অনুরাগী ছিলেন। তবুও কারো কাছে তিনি কোনদিন কিছু সুযোগ-সুবিধা চেয়েছেন তেমন কথা তাঁর কোন শত্রুও বলতে পারবে না। তাঁর কিছু উপকার করতে পারলে সবাই বরং নিজেদের

ধন্য মনে করতেন। তাঁর বা তাঁর নিকট-আত্মীয়দের চিকিৎসা করে বিধান রায় ফি নেননি কোনদিন। তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য ফি দিতে গেলে ঢাকার সুবিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার নন্দী নাকি জিব্ কেটে বলেছিলেন: আমি যে মুজাফ্ফর সাহেবের স্ত্রীর চিকিৎসা করার সুযোগ পেয়েছি এতো আমার জন্য এক পুণ্যকর্ম। তাঁর প্রতি অরাজনৈতিক শিক্ষিতজনেরও এছিল মনোভাব।

বাংলাদেশের মানুষ আমরা সবকিছু দেরিতে আবিষ্কার করি। এ ঘরের মানুষটিকেও আমরা অনেক দেরিতে, তাঁর মৃত্যুর পর আবিষ্কার করেছি। জীবিতকালে তাঁর আত্মীয়দেরও তাঁর প্রতি অনীহা ছিল। পাছে সরকারী চাকরি না পান এ ভয়ে পরিচয় দিতেও চাননি অনেকে। তাঁর এক নিকটতম আত্মীয়ের সরকারী চাকরি যাতে খতম করে দেয়া যায় এ উদ্দেশ্যে আমাদের কেউ কেউ মার্শাল ল' কর্তৃপক্ষের কাছে একদা বেনামীতে এ সত্যটুকুও জানিয়ে দিয়েছিলেন যে: ইনি কমরেড মুজাফ্ফর আহমদের আত্মীয়। যে মুজাফ্ফর আহমদ ভারতে কমিউনিজমের জনক। এমন কাণ্ডের নায়কেরাও এখন দেখতে পাচ্ছি কমরেড মুজাফ্ফর আহমদের নামে উচ্ছ্বসিত!

নিঃসন্দেহে এ শুভ লক্ষণ। আশা করা যাক্, এ আবিষ্কারের ফলে মুজাফ্ফর আহমদের আদর্শ-নিষ্ঠা আর চারিত্রিক সততা স্বচ্ছ চিন্তা আর পরিচ্ছন্ন জীবনবোধ আমাদের রাজনীতি আর জন-জীবনে কিছুটা অন্তত প্রভাব বিস্তার করবে। আর দেশ ও দশের মানুষের সম্বন্ধে সস্তা আর ফাঁকা আবেগ-উচ্ছ্বাস ছেড়ে, মরহুম মুজাফ্ফর আহমদের মতো বস্তুনিষ্ঠ তথা সত্যনিষ্ঠ হতে শিখবো আমরা সবাই।

গদ্যশৈলী ও দু'টি নতুন গদ্যগ্রন্থ

সাহিত্যের আদিম রূপ কাব্য হলেও কালক্রমে গদ্যেরই ঘটেছে অধিকতর সম্প্রসারণ। গদ্য মূলতঃ প্রয়োজনেরই মাধ্যম আর দিন দিন ব্যক্তি আর সমাজের প্রয়োজনের সীমারেখা যে কিরকম অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে, তা কারো অজানা নয়। গদ্যের সম্প্রসারণ এ কারণে শুধু স্বাভাবিক নয়, অনিবার্যও। ফলে গদ্যের শাখা-প্রশাখা আর ডাল-পালার অন্ত নেই আজ। যা একদিন বিশেষভাবে কাব্যের এলাকাভুক্ত ছিল, ছন্দ-ভাঙ্গার মতো তাও আজ কাব্যের আগল ভেঙে গদ্যের সীমানায় করেছে অনুপ্রবেশ। এতে গদ্যের বিস্তার, সমৃদ্ধি আর বৈচিত্র্য যে বেড়ে গেছে, তাতে সন্দেহ নেই। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ নামে আজ যা চিহ্নিত, তাতে কাব্য আর কাব্যধর্মিতার লক্ষণ প্রচুর। কবিতায় যেমন কবির ব্যক্তি-মানস আর সহজাত প্রবণতা প্রতিফলিত, তেমনি ব্যক্তিগত প্রবন্ধেও ঘটে সে-সবের প্রতিফলন। লেখকের মন-মেজাজ, পছন্দ-অপছন্দ, রুচিপ্রবণতা ইত্যাদির স্বাক্ষর তাতে সুস্পষ্ট। লেখক-রূপী ব্যক্তি মানুষটা ব্যক্তিগত প্রবন্ধে অতি সহজে ধরা পড়ে তখন চেনা মানুষটাও হয়ে উঠে আরো চেনা এবং আরো অন্তরঙ্গ। এ ধরনের রচনায় লেখকের ব্যক্তিসত্তা আর শিল্পীসত্তা প্রায় এক হয়ে মিশে যায়। সুলিখিত ব্যক্তিগত প্রবন্ধে এ কারণে পাওয়া যায় এক বিশেষ স্বাদ, যে স্বাদ মনের সঙ্গে, মনের সাযুজ্যের। এক হিসেবে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ আত্মজীবনীরই পরিপূরক। যে কারণে আত্মজীবনী আমার প্রিয়পাঠ্য। সে একই কারণে ব্যক্তিগত প্রবন্ধও। পরিচিতজনের হলে ত কথাই নেই। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ লেখকের মনের ইতিহাস, অন্তরলোকের আত্মচরিত।

সম্প্রতি দু'টি ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সংকলন পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে। পড়ে পরিপূর্ণ আনন্দ যে পেয়েছি, তেমন কথা হয়ত বলতে পারবো না। তবে একটা নতুনত্বের স্বাদ যে পেয়েছি, তাতে সন্দেহ নেই। সাহিত্য-

শিল্পে নতুন স্বাদের মূল্য যথেষ্ট। বই দু'টিতে গদ্যশৈলীর বিশেষ একটা ভংগিও লক্ষ্য করার মতো। যা হয়ত লেখকদের নিজস্ব রচনাশৈলী। বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীরের 'দক্ষিণে' আর সানাউল হকের 'ইচ্ছা ব্যাপ্তি আনন্দ' দু'টি ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সমষ্টি। এ দু'জন সুপরিচিত লেখক কবিতাও লিখে থাকেন, প্রথমজন শিল্প-সমঝদার, চিত্রশিল্পের এক দক্ষ ভাষ্যকারও। সূচনায় সসংকোচে স্বীকার করছি এ দু'জনের গদ্য সম্বন্ধে আমি কখনো তেমন উৎসাহী পাঠক ছিলাম না আগে। আমার কাছে কেমন যেন জটিল আর প্যাঁচানো মনে হতো এঁদের ভাষা আর বলার কৌশল। আমি সহজবোধ্য সারল্যের পক্ষপাতী। গদ্যের বেলায় এ পক্ষপাত বেশী এ কারণে যে, বক্তব্যই গদ্যের প্রধান লক্ষ্য, কিছু জানানোই তার অভিষ্ট—যা আমি জানতে চাই, বুঝতেও চাই পড়ে। কবিতার বেলায় আবেগের অনুরণনে বা ভাবের অস্পষ্ট ছোঁয়ায় আমি হয়ত সন্তুষ্ট, কিন্তু গদ্যের সবটুকু আমি চাই আর বোধে ধরতে।

দেহ আত্মার সম্পর্কের মতো, আমার বিশ্বাস, সাহিত্যে ভাব তথা বক্তব্য আর প্রকাশশৈলীর সম্পর্কও অচ্ছেদ্য আর তা প্রতি মানুষকে যেমন, তেমনি প্রতি খাঁটি লেখককেও দিয়ে থাকে ব্যক্তিসত্তার স্বাতন্ত্র্য আর বিশিষ্টতা —যার এক নাম নিজস্বতা। দৈহিক অবয়বে যেমন, তেমন মনের চেহারায়ও প্রতিটি মানুষ আলাদা। লেখকমাত্র অন্তর্ধর্মী আর নিজের অন্তর-দর্শনের অনুশীলনকারী বলে তাদের মনের চেহারার পার্থক্য আরো বেশী প্রকট। লেখক হিসাবে কে-না বিশিষ্ট হতে চায়? তবে জোর করে বা জটিলতার পথে যে বিশিষ্টতা, তা তেমন দীর্ঘজীবী হয় কি না, সে সম্বন্ধে আমার বিস্তর সন্দেহ আছে।

সমারসেট মমকে নাকি একবার এক পাঠক বলেছিলেন: আপনার বই পড়তে আমার একবারও অভিধান দেখতে হয়নি। মম এ মন্তব্যকে তাঁর লেখার প্রতি সবচেয়ে বড় কমপ্লিমেণ্ট মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথ কিংবা শরৎচন্দ্রকে পড়তেও আমাদের অভিধানের আশ্রয় নিতে হয় না। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের বেলায় হাতের কাছে রাখতে হয় কোন না কোন অভিধান। এ যুগের একজন বিশিষ্ট বাঙালী কবি হিসেবে সুধীন্দ্রনাথকে আমি পড়াতে আর বুঝতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাঁকে আমি কখনো আমার প্রিয় লেখক ভাবতে পারিনি। তেমনি সানাউল হক আর বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরও

আমার খুব প্রিয় লেখক নন ; তবে এঁদের লেখাও আমি পড়ি, পড়ে পরিচিত হতে চাই এঁদের ভাবনা-চিন্তা আর সাহিত্যকর্মের সঙ্গে। কারণ এঁরা দু'জনও পূর্ববাংলার সাহিত্যে বেশ কিছুটা বিশিষ্টতার দাবি রাখেন। এঁদের জটিলতা সুধীন্দ্রনাথের সমগোত্রীয় নয়—এঁদের জটিলতা এঁদের কাব্যগঠনে, রচনাশৈলীতে, প্রকাশের ভংগিতে। অবশ্য এ স্রেফ ব্যক্তিগতও হতে পারে অর্থাৎ আমি কিছুটা সেকেলে বলেই এ যুগের দু'জন বিশিষ্ট লেখকের রচনা আমার কাছে জটিল ঠেকছে। আধুনিকদের তা নাও ঠেকতে পারে।

কারণ যাই হোক, এঁদের রচনা সম্বন্ধে আমার ধারণা যা ছিল, শুধু তাই অকপটে প্রকাশ করলাম উপরে। উপহার পেয়ে এবার এঁদের দু'টা আস্ত বই পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে—বলা বাহুল্য. উপহার পাওয়া বই না পড়াটা আমি শুধু কর্তব্যচ্যুতি মনে করি তা নয়, মনে করি এতে লেখকের প্রতি চরম উপেক্ষা দেখানোও হয়। অবশ্য সব উপহার পাওয়া বই সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের তাগাদা বোধ করি, এ কথা বললে ভুল বলা হবে। সানাউল হক বা বোরহানউদ্দীন কেউই উপেক্ষা করার মত লেখক নন। বলেছি, এঁরা আমার তেমন প্রিয় লেখক নন, তবুও পড়ার পর তাগাদা বোধ করছি এঁদের বই দু'টা সম্বন্ধে কিছু কল্পনা-জল্পনার।

বোরহানউদ্দীনের 'দক্ষিণে' ১১০ পৃষ্ঠার ছোট বই। কোন ভূমিকা নেই বলে বইটির নাম আমাকে কোন অর্থেরই ইংগিত দেয়নি প্রথমে। পড়ার পর মানচিত্র দেখে বুঝতে পারলাম, অস্ট্রেলিয়া দেশটা আমাদের দক্ষিণে আর লেখক সে দেশে ট্রেনিং উপলক্ষে বা সফরে গিয়েছিলেন—যার অভিজ্ঞতার আলোয় এ বই লেখা। স্থান-পাত্র আর বিষয়বস্তু সবই ওখানকার—এমনকি বইটি যাঁদের নামে উৎসর্গ করা, তারাও বিদেশী-বিদেশিনী। বইটির বড় গুণ ভাষা আর বর্ণনাশৈলী। এ বইতে বোরহান স্বচ্ছ, প্রাঞ্জল আর কলম তাঁর অবাধ ও গতিশীল। সাহিত্যের একটা আমেজ পাওয়া যায় বলে এ বই পড়া যায় সানন্দে। আমি যে মুক্তমনের ভক্ত 'দক্ষিণে' সে মনেরই প্রতিফলন, একারণেও বোধ করি বইটি আমার ভালো লেগেছে। লেখকের মন-মেজাজ রুচিশীল ও বিদগ্ধ। প্রতি পৃষ্ঠায় মেলে তারই পরিচয়। তিনি সর্বসংস্কারমুক্ত এক অসীম উদার মনের অধিকারী। ওদেশের নদ-নদী, প্রকৃতি আর যে স্বল্প সংখ্যক নর-নারীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় আর সাময়িক সখ্যতা জন্মেছিল, তাদের কথাই বইটিতে পেয়েছে প্রাধান্য। এ বইর প্রধান আকর্ষণ বিষয়বস্তু নয়, ভাষা আর প্রকাশশৈলী।

বিষয়বস্তুর সঙ্গে আন্তরিক যোগাযোগ আর গভীর সহানুভূতি ছাড়া সাহিত্য হয় না—দক্ষিণে বিষয়বস্তুর সংকীর্ণতা ডিঙ্গিয়ে সাহিত্য হয়েছে। কারণ, লেখক আন্তরিক আর সংবেদনশীল। তিনি কলমের আর মনের এক সহজ গতিতে ছবির পর ছবি এঁকে গেছেন, যা সুদূরের হওয়া সত্ত্বেও পড়তে পড়তে চাক্ষুষ হয়ে ওঠে। এ বই থেকে নির্বিচারে একটি অংশ উদ্ধৃত করলাম: বসবাস ঘরে· স্বল্প অন্ধকার ছাড়ানো. জানালা বন্ধ মৃদু বাতি জ্বেলে দিল ডরোথী। জর্জ নিয়ে এলো শেরী, বিয়ার আর কেক, রেকর্ড চাপিয়ে দিলো চেঞ্জারে, সপাব সঙ্গীতে ভরে উঠলো ঘর, পালতোলা নৌকার রাত্রির মতো বোধ জেগে উঠল মনে, মৃদুকোমল, ঘুম পাড়ানিয়া। সেই সময় একজন বুড়ো ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন, একটু কুঁজো চুল তুষারসাদা, জর্জ পরিচয় করিয়ে দিল: আমার বাবা। আমি হাত বাড়ালাম, ভদ্রলোক জবাবে কি যেন বলেন, বুঝলাম না, জর্জ ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিল, খানিক কথা বলে ভেতরে চলে গেলেন। জর্জ বল্ল, বছরখানেক হল এখানে এসেছেন, এখনো ইংরেজি শিখতে পারেননি, বয়েস তো কম নয়, নতুন করে আর একটা ভাষা শেখার মতো উদ্যমও নেই। মা আগেই গেছেন, বাবা একা থাকেন হাঙ্গেরীতে। বলে কয়ে নিয়ে এলাম এখানে। এখানে এসেও নিঃসঙ্গতা ঘুচলো না। নাতিদের আদর করতে চান, কিন্তু নাতিরা খাস অস্ট্রেলিয়ার বাসিন্দা, ইংরেজি ছাড়া আর কিছু জানে না। সারাদিন একা একা থাকেন, আমি কাজ থেকে ফিরে এলে আমার সঙ্গে কথা বলেন মাগিয়ারে। আমার দেশ তো অস্ট্রেলিয়া, কিন্তু তিনি তিনি তো হাঙ্গেরীর, ছেলের কাছে এসেও উদ্বাস্তু থেকে গেছেন।"

ছবিটা যে শুধু চাক্ষুষ হয়ে উঠেছে তা নয়, এক বেদনাবিধুর ক্লান্ত বৃদ্ধের জন্য মনটাও হয়ে ওঠে অস্থির আর বেদনার্ত। এমন অবস্থায়ও লেখক আবেগে বিগলিত বা হননি কিছুমাত্র বাক্‌মুখর। সংক্ষিপ্ত সংযত আর সংহত ভাষায় নিজের চোখের আর মনের দেখাকে, সে সঙ্গে নিজের মন-মেজাজকে শৈল্পিক রূপ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত। ভাবনা-চিন্তা বা নিজের বক্তব্য নিয়ে তেমন মাথা ঘামাননি তিনি—এ স্রেফ প্রকাশ, একটা হয়ে ওঠা, গড়ে ওঠা, যার অভিধা শিল্প। 'দক্ষিণে' পড়ে সাহিত্যের দক্ষিণ হাওয়ার কিছুটা পরশ পেলাম, একথা বলা যায়। সাহিত্য-পাঠকের জন্য এ কম লাভের কথা নয়।

সানাউল হকের 'ইচ্ছা ব্যাপ্তি আনন্দ' বেশ বড় বই, পৃষ্ঠাসংখ্যা ডিমাই ২৩৩। সানাউল হকের লেখক-জীবন দীর্ঘ—এ দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন বিষয়ে তিনি যেসব লেখা লিখেছেন, তার অনেকগুলো নিয়ে এ সংকলন। বইটি তিন অংশে বিভক্ত আর একুনে ৩১টি রচনা এর অন্তর্ভুক্ত। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য আর বিভিন্নতা রীতিমতো অবাক হওয়ার মতো। রচনাগুলির মধ্যে কালের ব্যবধানও অনেকখানি। কেউ এ বইকে রম্যরচনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। কোন কোন রচনায় রম্যরচনায় ঢং লক্ষ্য করা যায় বটে, কিন্তু এর কোনটাই খাঁটি রম্যরচনা নয়, লেখকের উদ্দেশ্যও বোধ করি নয় তা। আমার মনে হয়, এসব রচনায় সানাউল হকের শুধু যে মন-মেজাজ আর রুচিশীলতার পরিচয় ফুটে উঠেছে তা নয়, সব ক'টি রচনা পাঠ করলে তার জীবন-দর্শনেরও একটা সার্বিক পরিচয় মেলে বইটিতে। নাতিদীর্ঘ শিরোনাম প্রবন্ধটিকে তাঁর কনফেশন বা স্বীকারোক্তি হিসাবে ধরে নেয়া যায়, এছাড়া আরও বহুতর প্রবন্ধে তার পছন্দ-অপছন্দ, ভাল-লাগা, মন্দ-লাগা, বাসনা-কামনা,—এক কথায় তাঁর জীবন-দর্শন খণ্ডিতভাবে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। সাহিত্যের মাপকাঠিতে এ সংকলনের মূল্যমান অধিকারীরাই নির্ধারিত করবেন, কিন্তু আমার মতে, লেখকের দিক থেকে এ এক মূল্যবান প্রকাশনা। কারণ এ গ্রন্থে লেখকের তথা লেখকের মানস চেতনার একটা অখণ্ড পরিচয় পাওয়া যায়। এ সংকলন যেন তাঁর মনের পরিচয়পত্র—তাঁকে আমরা ভালো করে চিনতে আর জানতে পারছি এ লেখাগুলি থেকে। আমাদের জানা হয়ে গেল তার মন-মানসের রূপরেখা আর মননের দিগন্ত, তার প্রবণতা, তার আকাঙ্ক্ষা ও অনীহা, তাঁর ইচ্ছার স্বরূপ, তাঁর ব্যাপ্তি আর কিসে তিনি আনন্দিত। সম্ভবতঃ এ কারণেই বইটির নাম : 'ইচ্ছা ব্যাপ্তি আনন্দ'।

সানাউল হকের রচনার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ যে কিছু নেই, তা নয়। অহেতুক আর অতিমাত্রার অনুপ্রাস সানউল হকের রচনার একটি দুর্বলতা বলেই আমার বিশ্বাস। স্থানবিশেষে অকারণ অনুপ্রাস কিছুটা দুর্বোধ্যতারও কারণ হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এ দুর্বোধ্যতা কষ্টকল্পিত ও ইচ্ছাকৃত। যেমন বইটির উৎসর্গপত্র লেখা হয়েছে এভাবে : দুঃখের সত্তা কি নিজস্ব পুত্রবতী জননী কি নিঃস্ব। ছাপা হয়েছে কবিতার মতো এক পংক্তির নীচে রম্য পংক্তি। কিন্তু কথা হচেছ, এর অর্থ কি ? অনেক ভেবে-চিন্তে আমি এটুকুই মাত্র আন্দাজ করতে পেরেছি যে কোন এক

জননীকে বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে—সে নিজেরও হতে পারে কিংবা হতে পারে নিজের সন্তানের। বিশ্বের তাবৎ জননী হতেও বাধা নেই। তবে তিনি পুত্রবতী অর্থাৎ ছেলের মা। জিজ্ঞাসা করা যায়, কন্যাবতী জননী কি অপরাধ করলো? এ জিজ্ঞাসার কারণ এ গ্রন্থের 'নবজাতক' প্রবন্ধে সানাউল হক নিজেই হয়েছেন কন্যাসন্তান সম্বন্ধে সোচ্চার আর উচ্ছ্বসিত।

ভূমিকার তথা বইটির প্রথম বাক্যটি বুঝতেও আমাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। তবুও পুরোপুরি বুঝেছি, তেমন দাবি করতে সাহস পাচ্ছি না। বাক্যটি এই : "এ পুস্তকের দুটি রচনা—'সেতার' ও 'স্বাগত'—জেনারেশ্যান গ্যাপের হিসাবে ধূসর-সম্পর্কিত।" এ বুঝতে না পাবার জন্য আমার মোটা বুদ্ধিই হয়তো দায়ী। 'জেনারেশ্যান গ্যাপের' দ্বারা ইংরেজী Generation Gap কথাটাই বোধ করি বুঝানো হয়েছে। কিন্তু লেখকের বক্তব্য কি এতে খুব স্পষ্ট হয়েছে? বাংলায় কি কথাটি অধিকতর বোধগম্য করে বলা যেত না? আধুনিক সাহিত্যের রসাস্বাদনে কিছুটা মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে, কথাটা অন্যের মতো আমরাও বলেছি। কিন্তু এখন আমার নিজের মনেই জিজ্ঞাসা জাগছে, কি ধরনের মানসিক প্রস্তুতি থাকলে উদ্ধৃত কথাগুলির অর্থ পড়ামাত্রই আমি বুঝতে পারবো? 'জেনারেশ্যান গ্যাপের' দ্বারা তিনি বোধ করি কালের ব্যবধান বা ফাঁক বুঝতে চেয়েছেন। উৎসর্গপত্রের সঠিক অর্থ আজো আমার কাছে অবোধ্য রয়ে গেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নবীন অধ্যাপককে পড়তে দিয়ে ওটার মর্ম জানতে চেয়েছিলাম, শেষ পর্যন্ত মাথা চুলকিয়ে তিনিও তাঁর অক্ষমতাই জানিয়ে গেলেন।

আমি যে উপরে দুর্বোধ্যতার কথা বলেছি, সেটা এ ধরনের দুর্বোধ্যতা। শব্দার্থের দুর্বোধ্যতা নয়। বলা বাহুল্য, সুধীন্দ্রনাথ নিজের দেশেও এখন অনুসৃত নন—এখানকার অধিকাংশ গদ্যও নির্মল, সহজবোধ্য আর স্বচ্ছপ্রবাহী। পণ্ডিতী গদ্যের দিন এখানে-ওখানে সর্বত্রই শেষ হয়েছে। সানাউল হক যথেচ্ছ ইংরেজী শব্দও বাক্‌প্রকরণ ব্যবহার করেছেন। ইংরেজী বা কোন বিদেশী শব্দ সম্বন্ধে আমার কোন গোঁড়ামি নেই—আমি স্রেফ অকারণে, অপ্রয়োজনে প্রয়োগেরই বিরোধী। যা বাংলায় সহজে প্রকাশ করা যেতো, তেমন স্থলেও তিনি ইংরেজীর দ্বারস্থ হয়েছেন—আমার আপত্তিটা এ কারণে।

শিল্পের দুর্বোধ্যতা সম্বন্ধে সানাউল হকের মন্তব্য, "...আমাকে প্রায়শঃ (বরাত জোরে যেদিন কোন অভ্যাগত মেহমান আসেন) দেওয়ালের ওই ছবিটি (একখানা এ্যাবষ্ট্রাক্ট ছবি) কি এবং কেন তার জবাবদিহি করতে হয়। না-জওয়াব যেমন হওয়া যায় না, বিনীতকণ্ঠে এও বলা চলে না, বাজিমাতের ঘোড়া কি শিকারী কুকুরের যেমন ট্রেনিং প্রয়োজন, কোনো শিল্পীর তুলির রং রেখা ও শিল্পকাজ থেকে নয়নানন্দ লাভ করতে হলেও কিছুটা মানসিক প্রস্তুতি চাই।" পৃঃ ১২৮

ঘোড়া-কুকুরের ট্রেনিং আর মানসিক প্রস্তুতি কি একই ব্যাপার? একটি পেশী-স্নায়ু নির্ভর, অন্যটি মননাশ্রয়ী। এ উপমার দ্বারা তিনি কি মানসিক প্রস্তুতি কথাটাকেই উপহাস করতে চেয়েছেন? অথচ মানসিক প্রস্তুতি ছাড়া তাঁর নিজের রচনা উপভোগ করাই যায় না। এমনকি সাপ, ব্যাঙ, কাক সম্বন্ধে তিনি যা লিখেছেন, তার রসাস্বাদনও কিছুটা প্রস্তুতি ছাড়া সম্ভব নয়। সে মানসিক প্রস্তুতি নিশ্চয়ই বাজিমাতের ঘোড়া কিংবা শিকারী কুকুরের ট্রেনিং-এর সমপর্যায়ের নয়। মানসিক প্রস্তুতি অর্থে আমি মনে করি উদার লেখাপড়া, মন-মানসের ঔদার্য আর গ্রহণশীলতা। সে সঙ্গে হয়ত যোগ করা যায় মনের অবিরাম অনুশীলন-পরিশীলন আর বুদ্ধিচর্চা।

সমগ্র বইটি পড়ার পর সানাউল হকের রচনা সম্বন্ধে উপরে আমি যা বল্লাম, তাকে 'এহ বাহ্য' মনে করা যায়। এ মনে করে বইটি পাঠ করলে পাঠক নিঃসন্দেহে উপকৃত হবেন। গদ্যরচনাও শুধু খবর বা বক্তব্য যোগায় না, যোগায় আনন্দও। পড়ে আনন্দ পাওয়ার মতো বহু কিছু এ বই-এর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। সবচেয়ে বড় কথা, লেখাগুলি একটি রুচিশীল বিদগ্ধ মার্জিত মনের পরিচয় বহন করে। 'দক্ষিণে'র তুলনায় এ বইর পরিধি ও পরিসর অনেক বড় ও ব্যাপক। হেন জিনিস নেই যা এতে স্থান পায়নি। আগে সাপ, ব্যাঙ, কাকের উল্লেখ করেছি। শাড়ী, নবজাতক, বাসরঘর, স্ত্রী, শর্টকাট, কান্না আমার বন্ধুরা, মোহসেন আমি পাঁচটি পাখী, পাহাড়, রটনা ও ঘটনা, হে হৃদয় ইত্যাদি আরো বহুতর সরস রচনা এ বইতে স্থান পেয়েছে। সানাউল হকের রচনাশৈলীর বিশেষ ভংগিটির সঙ্গে পরিচয়ে অনীহা না থাকলে এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত সব রচনাই উপভোগ্য মনে হবে। আমার কাছে তা-ই মনে হয়েছে। প্রাথমিক অনীহাকে উপেক্ষা করতে পেরেছি বলে আমি নিজেকে নিজে ধন্যবাদ দিই। লেখক শুধু রসিক নন, রুচিবানও। এ দুয়ের সমন্বয় খুব কম ক্ষেত্রেই

দেখা যায়। সানাউল হকের নিজের মন্তব্য: "রসের জগতে, হাস্যরসের ক্ষেত্রে বা বুদ্ধিদীপ্ত আলাপ-সংলাপে, নিয়মনীতি রাজনীতির ধার ধারে না। ক্ষুরধার কথায় কে কাটা গেল আর ফাঁপানো কথায় কে উঠল, এ নিয়ে অনর্থক মাথা ঘামানো। রুচিরসে সজ্জিত হয়েই কথা কুসুম হয়, আরো পরিপক্ক হয়ে হয় ফল।" (পৃঃ ১০৭) তাঁর এ মন্তব্য তাঁর এ লেখাগুলোর বেলাও প্রয়োগ করা যায়। সত্যই তাঁর লেখা 'রুচিরসে সজ্জিত'। তবে তিনি আরো সহজ, আরো সরল হলে খুশী হতাম। এ বইতেও সাহিত্যের আমেজ আর সৌরভ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। রচনাগুণে আটপৌরে আর অতি পরিচিত বিষয়ও সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ হয়ে দেখা দিয়াছে।

পূর্ববাংলার সাহিত্যে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সংখ্যা খুবই সীমিত। সেদিক থেকেও এ সংকলনটিকে স্বাগত জানাতে হয়। মনে হয়, আমাদের মধ্যে সানাউল হকই সব চেয়ে বেশী লিখেছেন ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। 'মূল্যবান সংযোজন' কথাটা বড্ড পুরোনো আর একঘেয়ে হয়ে পড়েছে। তাই পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। তবে বিনাদ্বিধায় বলতে পারি 'ইচ্ছা ব্যাপ্তি আনন্দ' আমাদের সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট প্রকাশনা।